পৃথিবীর ইতিহাস
ব্রহ্মদেশ
শ্রীমনোরমা দেবী
প্রণীত
শিশিরকুমার মিত্র
-এ সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ,
শিশির পাবলিসিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৯৫১
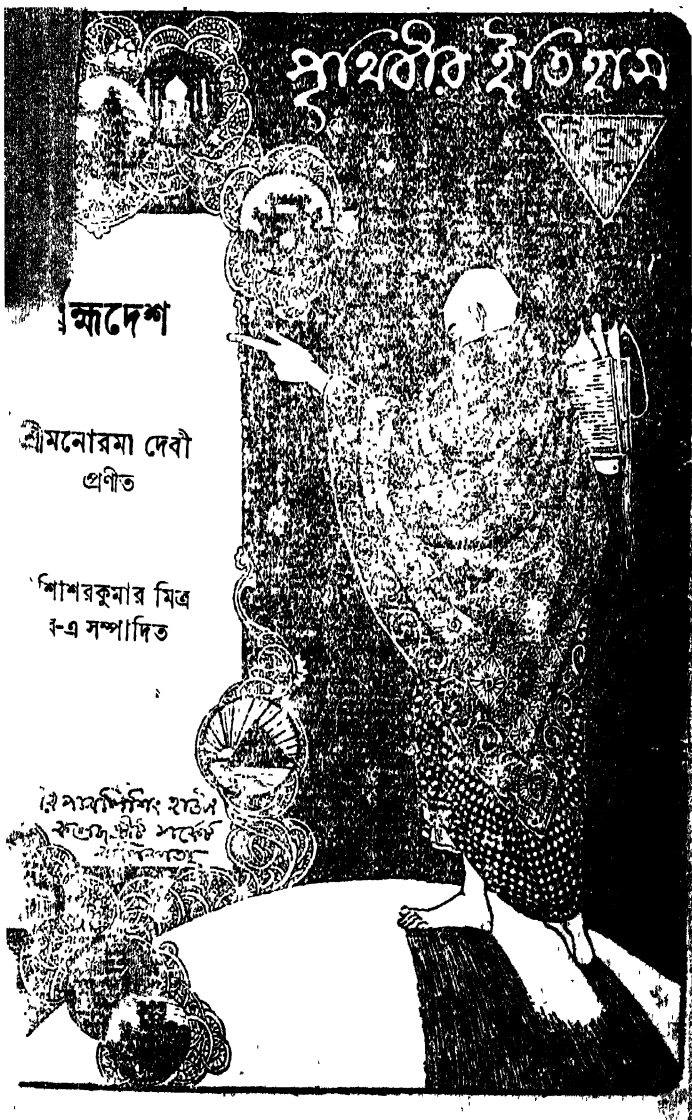
পৃথিবীর ইতিহাস
এই সিরিজের
গ্রাহক আজও না
হইয়া থাকিলে
আপনার—ছেলে-
মেয়েদের শিক্ষা
অসম্পূর্ণ থাকিয়া
যাইবে।
পরের পৃষ্ঠাগুলি
পড়ুন
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
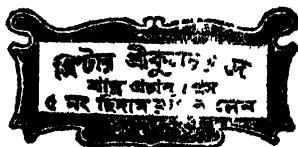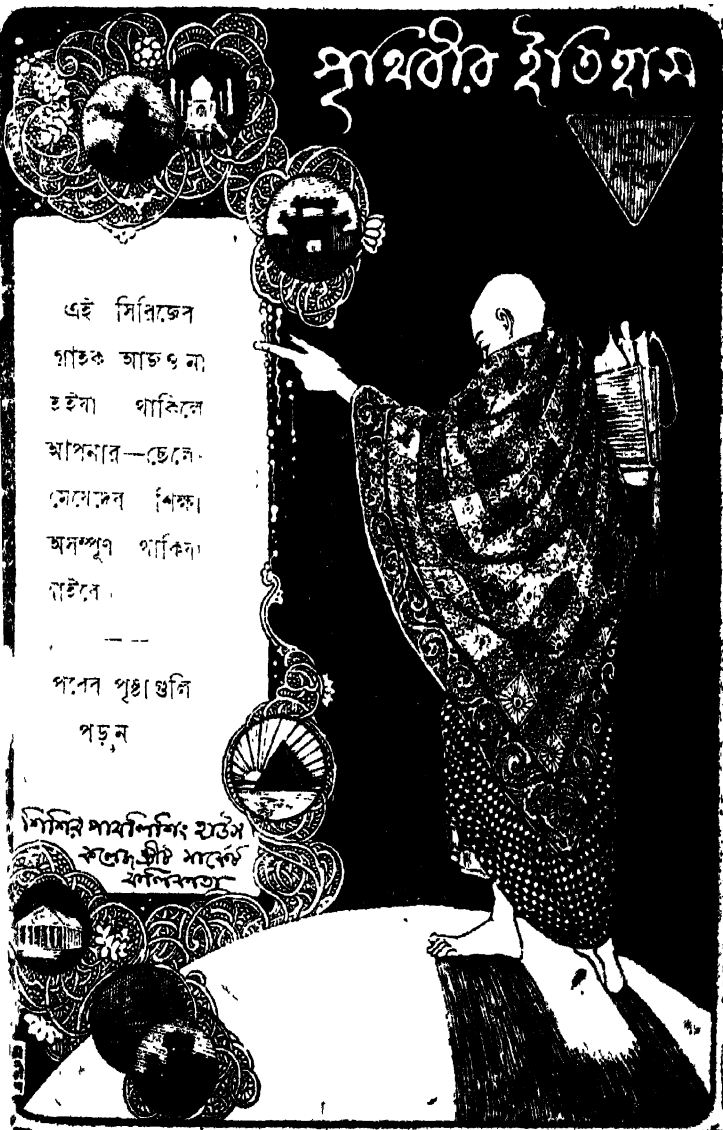
পড়ুন

কাজটা দেশের কাজ। এত বড় একটা কাজ যাতে সহানুভূতির অভাবে নিবে না যায়—তার জন্য আমি বাংলা দেশের অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিকট আবেদন করছি। আশা করি তারা আমার এ আবেদন অগ্রাহ্য করবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রত্যেক বাঙ্গালী অভিভাবক তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই সিরিজের গ্রাহক হউন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

বৈদিক ভারত
ইংলণ্ড
গ্রীস
জাপান
ব্রহ্মদেশ
রোম
মিশর
চীন
জার্ম্মেণী
পারস্য

নিবেদন

বাঙ্গালা দেশে শিশুসাহিত্যের একান্ত অভাব। সেই অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ খানি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করিয়াছি। যাহাদের জন্যে এই বইগুলি লিখিত, তাহাদের কাছে যে ইহা আদৃত হইয়াছে--ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

বাঙ্গালাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা আর একটি বড় কাজে হাত দিয়াছি। ছেলেমেয়েরা যাহাতে এখন হইতেই কূপমণ্ডুক না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহাদের শিক্ষা ও চিন্তা পরিপার্শ্বস্থ সীমাবদ্ধ বেষ্টনী ছাড়াইয়া জগতের বিস্তৃত জ্ঞানালোক পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে তাহারই জন্য পৃথিবীর নানা জাতির ইতিহাস, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের রীতি নীতি, পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য—সরল সুন্দরভাবে গল্পের ছলে তাহাদের শুনাইব মনস্থ করিয়াছি। ছেলেমেয়েরা ছবি দেখিতে ও গল্প শুনিতে ভালবাসে; তাই পৃথিবীর ইতিহাস বলা হইবে শুধু গল্প ও চিত্রের মধ্য দিয়া—ইহাতে নিরস বক্তৃতা থাকিবে না।

শিশুশিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বইগুলি যে বাঙ্গালাসাহিত্যের কিরূপ অমূল্য সম্পদ হইবে তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই কয়েকখণ্ড বই যদি ছেলেমেয়েরা একবার পড়ে তবে পৃথিবীর-সম্বন্ধে তাহাদের আর অজানা কিছুই থাকিবে না। এক একটি জাতির উত্থান পতনের কারণ নির্ণয় করিতে করিতে তাহারা মানব জীবনের কত যে চিরন্তন সত্য জানিতে পারিবে, এক-একটি আত্মত্যাগী [illegible] দেশভক্তের নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলী পড়িতে পড়িতে তাহারা ত্যাগের [illegible] আদর্শ দেখিতে পাইবে তাহাতে ছেলেমেয়েদের কচি কচি মনগুলি

শিশুকাল হইতে তেমনই সুগঠিত হইয়া উঠিবে, এখন হইতেই তাহারা শয়নে স্বপনে সেই চিন্তা সেই ধ্যান করিতে করিতে কালে তাহাদেরই আদর্শে নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

আমাদের এই শিশুপাঠ্য পৃথিবীর ইতিহাসের বিশেষত্বই এই যে ছেলেমেয়েরা এই গল্প ও ছবিগুলি আগ্রহের সহিত পড়িবে ও দেখিবে। আমরা ছেলেমেয়েদের জন্য এমন কিছু প্রকাশ করিব না, যাহা সাহিত্যের দিক দিয়া খুব উঁচুদরের হইলেও শিশুরা যাহার ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষিতে পারে না।

যে কার্য্যে আমরা হাত দিতে যাইতেছি, তাহা এদেশের পক্ষে নূতন হইলেও ইউরোপ প্রভৃতি প্রদেশে সে-সব কিছুমাত্র নূতন নহে— এরূপ অভিনব, সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তক সে সব দেশে বিস্তর বাহির হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের কোন প্রকাশকই আজ পর্য্যন্ত এত বড় কার্য্যে হাত দিতে সাহস করেন নাই। আমরা সংশয়চিত্তে দেশের অনেক গণ্যমান্য বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের অধিকাংশই আমাদের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ করিয়া আমাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে বাঙ্গালা দেশে এত ভাল জিনিষের কদর বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত পাঠকবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি পাইব। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিকট হইতে এ দাবী আমরা করিতে পারি।

গুরুতর ভার মাথায় লইয়া পৃথিবীর ইতিহাস প্রকাশ করিতে নামিলাম—ভরসা শুধু এই—যে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ভার তাঁহাদের নিজের স্কন্ধে লইবেন। মনে রাখিবেন, এ কাজ শুধু [illegible] নয়,—এ দলের কাজ, দেশের কাজ, তাই এ কাজ তাঁহাদেরও [illegible]

এই যে একটা গুরুতর অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া,—বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নরনারীর মন হইতে অজ্ঞানতা এবং কূপমণ্ডুকতা দূর করিবার এই যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা প্রায় সর্ব্বস্ব পণে এই "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" প্রকাশ করিতেছি, তাহার আবশ্যকতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞান সভ্যতার এই বিশ্বব্যাপী উন্নতির দিনে —যখন প্রতি দিনে, প্রতিমুহূর্ত্তে এই বিপুল পৃথিবীর প্রতি দিকটা হইতে নূতন জ্ঞানের নূতন সভ্যতার, নূতন উন্নতির স্রোত প্লাবনের বেগে আসিয়া, ভারতকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে--তখনও কি ভারত বিশ্ব সম্বন্ধে এমনি উদাসীন থাকিবে?—এখনও কি সে তাহার মনের কবাট, বুদ্ধির কবাট, জ্ঞানের কবাট রুদ্ধ করিয়া এই প্লাবনের স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে? তা যদি সে করে তবে সে স্রোতে ঘর দুয়ার সমেত সেই ডুবিয়া যাইবে--স্রোত বন্ধ হইবে না। আজ বিশ্বের কত বিভিন্ন জাতি, তাহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা, তাহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জাতীয় ইতিহাস, রীতিনীতি, সভ্যতা,--তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া প্রতিনিয়তই ভারতের সংস্পর্শে আসিতেছে,—আজ যদি ভারত তাহাদের সে বিশিষ্টতাগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহাদের সহিত আপোষ করিয়া না ফেলিতে পারে,—তবে ভারতের অস্তিত্ব আর বড় বেশী দিন নয়।

শুধু তাই নয়;—আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে—সমাজের প্রতি বিভাগে যে সঙ্কীর্ণতা,—যে স্বার্থপরতা—অজ্ঞানজনিত যে আত্মম্ভরিতা স্তুপীকৃতভাবে জমা হইয়া আছে, তাহা দূর করিতে হইলে, দেশকে এবং জাতিকে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আমাদের হৃদয় এবং জ্ঞান এই দুইটারই পরিধি অত্যন্ত বাড়ান দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস প্রকাশ করা। শুধু দেশের ইতিহাস প্রকাশে এ কার্য্য সাধিত হইবে না;—out look বাড়াইতে

হইলে সারা পৃথিবীর কথাই জানিতে হইবে—আর সেই সঙ্গে জানাইতে হইবে এই বিপুল পৃথিবীর মাত্র কতটুকু অংশ জুড়িয়া পড়িয়া আছে আমাদের এই ভারত।

আজকাল বালকবালিকাদিগকে Liberal Education দিবার একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে,—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর প্রভৃতি কথা উঠিয়াছে—কিন্তু Liberal Education হইবে কোথা হইতে?— সমাজের সঙ্কীর্ণতা যাইবে কি করিলে?—গোড়ায় যে আমাদের ঘুণ ধরিয়াছে। আমাদের জাতীয় মনটাই যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীই যে আমাদের নিকট অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়াছে। কূপের মণ্ডুক বলিয়াই না আজ ভারতের জাত্যাভিমানী সম্প্রদায় আমা-দিগেকে বিধাতার বিশিষ্ট অনুগৃহীত মনে করিয়া ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য, পশুবৎ মনে করিতেছে! এ মোহ,—অজ্ঞানতাপ্রসূত এই আত্মম্ভরিতা আর যাহাতে ভবিষ্যৎ ভারতীয়ের মনকে কলুষিত করিতে না পারে, অন্ততঃ তাহার জন্যও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা তাহাদের জানা আবশ্যক মনে করি। শুধু জানা নয়, পৃথিবীর তুলনায় ভারতের অবস্থা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

ইউরোপের বালক বাল্যকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা শুনিতে শুনিতে বড় হইতেছে—তাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাই সে চির তুষারময় মেরুপথের অভিযান খেলার স্বরূপ মনে করে,—তাই হিমালয়ের চিরহিমাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিবার নামে তাহার ধমনীর রক্ত আনন্দে লাফাইয়া উঠে। আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা? বেচারীদের পৃথিবী তো শুধু ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ড লইয়া।—তাই সে বড় জোর বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া একটা মোটা মাহিনার চাকরীর জন্য লালায়িত। এ শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয়;—এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমরাই। আমরাই না আমাদের বালকবালিকাদিগের নিকট পৃথিবীটাকে

এত ছোট করিয়া রাখিয়াছি। এখন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। উপযুক্ত পুস্তক আমরা আমাদের গায়ের রক্ত জল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলাম ;—এখন বাংলার অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সম্পন্ন করুন।—বালকবালিকাদিগের হাতে বইগুলি পৌঁছিবার ভার, তাঁহারা লউন।

শুধু বালকবালিকাদের হাতে পৌঁছিয়া দিয়াই যেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত না হন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে এক সেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" তুলিয়া দিন। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, বাহির অপেক্ষা অন্দরেই বেশী—সে সঙ্কীর্ণতা দূর করাই আগে দরকার। যাঁহারা জননী, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা যদি দূর না হয়, তবে সন্তানের সঙ্কীর্ণতা কি প্রকারে দূর হইবে? ইতিহাস নাম শুনিয়াই ঘাবড়াইবেন না। এ শুধু নিরস তারিখ সর্ব্বস্ব ইতিহাস নয়। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাই গল্পের আকারে এত সরস করিয়া বলা হইয়াছে—এত সুন্দর সুন্দর চিত্র সম্বলিত করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে যে অনেক সময় উপন্যাসের অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক মনে হইবে। আর তাহা ছাড়া, অজানা দেশের, কত অজানা কাহিনী—একঘেয়ে উপন্যাসের চেয়ে তাহা পড়িতে আগ্রহ আরও বেশী হওয়ারই কথা। যাঁহারা আমাদের "চিত্রে ও গল্পে" সিরিজের বিজ্ঞান, দেশবিদেশ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিকেও নানা দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক করিতে আমাদের যত্ন কত সাফল্য লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসেও সে চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। কারণ এ-কথাটা আমাদের খুব ভাল করিয়াই জানা আছে যে, যাহাদের জন্য এই বইগুলি লেখা, এগুলি পড়িতে তাহাদের আগ্রহ হওয়াটাই সব চেয়ে আগে দরকার।

'পৃথিবীর ইতিহাস' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নানা জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস—নানা দেশের কথা। আমরাও সেই ভাবেই

৫০ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাস—বাহির করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সে ভুল প্রথম ভাঙ্গেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি, বলেন, শুধু জাতির ইতিহাস ত পৃথিবীর ইতিহাস নয়। মানুষের কথা ছাড়াও এই পৃথিবীতে আরও কত সুন্দর সুন্দর জিনিষের কথা বলিবার আছে। এই পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীব জন্তুর কথা, এই পৃথিবীর নানা বিচিত্র দৃশ্য—তুষার হিমগিরিশৃঙ্গ, অসীম সমুদ্র প্রভৃতি স্বভাব দৃশ্য জীবন্ত ভাষায় ছেলেদের সম্মুখে না ধরিলে পৃথিবীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞানের কথাও বলিতে হইবে—মানুষ নিজের বুদ্ধি বলে এই পৃথিবীকে কেমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে—সে কথাও ছেলেমেয়েরা আগ্রহে অধীর হইয়া শুনিবে। আমরা তাই ১০ খণ্ডে সৃষ্টি রহস্যের (Romance of Creation) কথা বলিব।

এইভাবে অসংখ্য ছবি ও গল্পের মধ্য দিয়া সারা পৃথিবীর ইতিহাসটা বাংলাভাষায় প্রকাশিত করিবার আমাদের আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রথম, এই একমাত্র উপায়ে বাংলার বালিকা মহলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জননীদিগের নিকট এই অত্যাবশ্যক পুস্তকের সাদর অভ্যর্থনা মেলা সম্ভব। বাংলাভাষায় রচিত না হইলে তাহা সম্ভব হইত না— আর এত বেশী চিত্তাকর্ষক (Interesting) ভাবে লেখা না হইলেও, তাহা হইত না।

বালকদিগের সম্বন্ধেও এ কথা বিশেষভাবে খাটে। বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ইংরাজি শেখে বটে, কিন্তু ইংরাজিতে লেখা ৬০ খণ্ড বই হুস্ হুস্ করিয়া পড়িবার মত বয়স যখন তাহার হয় তখন সে সংসারে প্রবেশ করিবারই উদ্যোগ করে। কিন্তু ছবি ও গল্পভরা **Interesting** বাংলা বই ৬০ খানা সে অতি অল্প বয়সেই পড়িয়া ফেলিতে পারে,—তাহাতে কাহারও সাহায্যের দরকার নাই। অভিভাবকেরা মনে রাখিবেন যে, যে বয়সে বালক বালিকারা লুকাইয়া লুকাইয়া রাশি রাশি

বাংলা নাটক নভেলের শ্রাদ্ধ করিতে থাকে, সেই বয়সে যদি তাহারা হাতের কাছে একসেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" পায়,—তবে তাহা পড়িয়া উঠিতে শুধু যে তাহাদের বেশী সময় লাগিবে না, তাহা নহে ;—তাহার শিক্ষা ও চরিত্রের ধারা ভিন্ন পথে গিয়া, তাহাদিগকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিবে। হাতের কাছে এই চিত্তাকর্ষক গল্পময় ইতিহাস পাইলে অনেকেই আর বাজে উপন্যাস সংগ্রহ করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না।

বাংলার সহৃদয় শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে—তাঁহারা যেন ছাত্রছাত্রীদের মনে এই বইগুলি পড়িবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন। মনে রাখিবেন এ দেশের কাজ, আমাদের আর্থিক লাভ ইহাতে কিছুই নাই—বরং লোকসান অনেক আছে। আমরা জানি, এই ৬০ খণ্ড বহি ক্লাশে text করিয়া পড়ান অসম্ভব। তাহার দরকারও নাই। শুধু ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া, তিন চারিখানি বহি text হিসাবে পড়াইলেই যথেষ্ট। বাকিগুলি যাহাতে ছাত্র ছাত্রীরা বাড়িতে পড়িয়া লয়, তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা দরকার। আবশ্যক হইলে, প্রতি স্কুল লাইব্রেরীতে কয়েক সেট করিয়া পুস্তক আনাইয়া, প্রতি ছাত্র ছাত্রীকে সেইখান হইতে পড়িবার ব্যবস্থা করাইয়া দেন, তবে অতি সহজেই ইহার বহুল প্রচার হওয়া সম্ভব।

আমাদের আশা আছে, অতঃপর এমনই সুন্দর ও চিত্তরঞ্জন করিয়া বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠরত্নগুলি শিশুদের উপহার দিব। এমনই চিত্র গল্পের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের কথা শিশুদের শুনাইব। আমাদের এই সকল কল্পনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে বাঙ্গালা দেশের পাঠকবর্গের উপর। আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিবেন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, এই বিরাট কার্য্যের জন্য আমাদিগের

অনেক আর্থিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব। সে জন্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী অনেক বন্ধু আমাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের কাজ ভাবিয়া,—আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াই আমি এই কার্য্যে নামিয়াছি। নামিয়া অবধি অনেকের আন্তরিক সহানুভূতিও আমরা পাইয়াছি; বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রতিভাশালী গ্রন্থকার এবং চিত্রকর এই মহৎ ব্রত উদযাপনের জন্য অতি সামান্য মাত্র পারিশ্রমিকে প্রাণপণ শক্তিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমার নাই। আশা আছে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতেও যদি আমরা সেইরূপ সহানুভূতি পাই তবে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগের আর্থিক ক্ষতি নাও হইতে পারে। আর কি বলিব? জগদীশ্বর সাফল্য আনিয়া দিন। ইতি

সম্পাদক।

"পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে"।

পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী।

পোষ্টেজ বাবদ ২৲ দুই টাকা পাঠাইলেই মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। মাসিক গ্রাহকদের প্রতি মাসে যে কয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে তাহা ভি, পি, ডাকে ঐ কয়সংখ্যার মূল্য ১৲ হিসাবে ধার্য্য করিয়া পাঠান হইবে। গ্রাহকদের ভি, পি, পোষ্টেজ, প্যাকিং, মনিঅর্ডার প্রভৃতি চার্জ্জ বাবদ আর কিছু লাগিবে না। ঘরে বসিয়া পুস্তক মূল্যেই তাঁহারা বই পাইবেন। প্রতি সংখ্যা ভি, পিতে পাঠাইতে হইলে প্রায় ।৵০ অতিরিক্ত লাগে, সে ছয় আনা আমরাই দিয়া দিব। মাত্র দুই টাকা পোষ্টেজ বাবদ পাঠাইয়া (ছয়খানা বহির পোষ্টেজেই তাহা কাটিয়া যাইবে) গ্রাহকেরা ৬০ খানি বই পোষ্টেজ ফ্রিঃ পাইবেন। নিয়মিত গ্রাহকদের এত সুবিধা আজ পর্য্যন্ত আর কেহ দিতে পারেন নাই। এ সুযোগ হারাইবেন না।

আজই গ্রাহক হউন।

PLAN.

দেশ বিদেশ
চিত্রে ও গল্পে

উদার ও সার্ব্ব-জনীন শিক্ষা পাইতে হইলে দেশ বিদেশের সহিত ছেলেমেয়েদের পরিচয় হওয়া আবশ্যক ;—শুধু গল্পের মধ্য হইতে এত সুন্দর ও সহজ ভাবে এই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যে শুধু এই বইখানি পড়িলেই ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জাতি ও দেশ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মিবে।

নানা দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব, নানা জাতির ইতিহাস, তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি পদ্ধতি, প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব এই সব অতি সুন্দর সরলভাবে চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য ১৲ টাকা।

দেশ বিদেশ চিত্রে ও গল্পে

রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের সময় জাপানী মেয়েরা তাহাদের বড় সাধের লম্বা বেণী কাটিয়া দিতেছে—যুদ্ধের খোরাক যোগাইবার জন্য।

এম্‌নি অসংখ্য ছবি—সুন্দর গল্প।

আদিম জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৲

প্রাচীন জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৲.

বর্ত্তমান জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৷৷৹

সারা বিশ্বের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে ৬০ খণ্ড বইতে। সে এক বিরাট ব্যাপার। কিন্তু ঐ ৬০ খণ্ড বই কিনিবার শক্তি কিম্বা সামর্থ্য ও সকল গুলি বই পড়িবার ধৈর্য্য অনেকেরই নাই। এক রাশ পাঠ্য পুস্তকের বোঝা মাথায় চাপাইয়া শিশুরা বাল্যকাল হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সারা পৃথিবীর নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেও জানিবার ও পড়িবার ইচ্ছা তাহাদের আদৌ থাকে না। তাহাদেরই জন্য বিশ্বের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে তিন খণ্ডের মধ্যে গল্প করিয়া বলা হইয়াছে। যাহারা চট্ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পড়িয়া সে সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি ধারণা জন্মাইতে চাহেন, তাহাদের নিকট এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছোট্ট সংস্করণ পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনা নাই।

তিন খণ্ডে আছে পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মোটামুটি সকল বিবরণ। জাতির ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় ইহাতে সে সমুদয়ই পাইবেন, আর পাইবেন আদীম জগতের ইতিহাস—পৃথিবীর সেই প্রথম যুগের কথা —পৃথিবীর জন্ম, মানুষের জন্ম, সভ্যতার ধীরে ধীরে মানুষের ক্রমোন্নতি। এই তিন খণ্ডই বালক বৃদ্ধ সকলেরই এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন

জগতের কীর্ত্তিলেখা পড়িতে পড়িতে আপনি আনন্দে বিভোর হইবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়িবেন বর্ত্তমান জাতি সমূহের ইতিহাস, কেনই বা এক জাতি এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে; আবার আর এক জাতি পরাধীন হইয়া তাহারই দাসত্ব করিতেছে। প্রতি শিক্ষক প্রতি অভিভাবকদের কর্ত্তব্য এই বই তিন খানি শিশুদের কণ্ঠমণি করিয়া বাঁধা। শুধু গল্প ও ছবি, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, সরল প্রাঞ্জল রূপকথার মত। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা।

শিশির পাবলিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মৃত্যুশয্যায় রাজা আলম্প্রা।

ব্রহ্মদেশ

প্রথম অধ্যায়

দেশের প্রথম-পরিচয়

"চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান!"

আমাদের বাঙ্গলাদেশের কবি হেমচন্দ্র এক সময়ে স্বাধীন ব্রহ্মদেশকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন একথা আর খাটে না। ব্রহ্মদেশও এখন ভারতের ন্যায় ইংরাজের অধীন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা-দেশের লোকেরা ব্রহ্মদেশের নাম জানিতেন। টলেমি নামক একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি পৃথিবীর

নানাস্থানের মান চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই মানচিত্রে ব্রহ্মদেশের নাম "ক্রিসিকারসন্" অর্থাৎ স্বর্ণ উপদ্বীপ এইরূপ লিখিত রহিয়াছে।

সোণার দেশ

তোমরা রূপকথায় কি এমন কোন দেশের পরিচয় পাও নাই, যে দেশের গাছে গাছে মুক্তা ফলে, নদীর জলে সোণা ঝলে? তেমন কোন দেশ যদি কোথাও থাকে, সে এই ব্রহ্মদেশ। এক সময় ছিল যখন এদেশের নদীর জল হইতে প্রচুর সোণা পাওয়া যাইত। সেজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা এদেশের নাম দিয়াছিলেন 'সুবর্ণভূমি' বা সোণার দেশ।

ব্রহ্মদেশ বড় সুন্দর দেশ। বড় বড় নদী, উচু পাহাড়, সবুজ শস্তে ভরা বিশাল মাঠ, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এসিয়ার মানচিত্র খানা খুলিয়া দেশটি কোথায়, তাহার অবস্থান কিরূপ তাহা বুঝিয়া লও। এদেশের উত্তরে তিব্বত, পূর্ব্ব সীমা চীন, ও বেশান নামক ছোট ছোট রাজ্য এবং শ্যাম দেশ, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এবং ভারতবর্ষ।

এক সময়ে এ দেশটি বড় ছোটখাট ছিল না, আসাম,

মণিপুর, ত্রিপুরার পর্ব্বতাঞ্চলও ব্রহ্মরাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল।

এইত গেল ব্রহ্মদেশের সীমার কথা। এখন দেশটি কত বড় একবার বলত? ব্রহ্মদেশ মোটামুটি উচ্চ এবং নিম্ন ব্রহ্ম এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। উচ্চ ব্রহ্ম কত বড় জান?—বাঙ্গালা দেশ ও আসাম এই দুইটী দেশ এক সঙ্গে করিলে যত বড় হয়, উচ্চ ব্রহ্ম প্রায় তত বড়। আর সমগ্র ব্রহ্ম দেশের ভূমির পরিমাণ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই একত্র করিলে যত পরিমাণ হয় তত,—প্রায় দুই লক্ষ আশী হাজার বর্গ মাইল।

আমাদের বাঙ্গালাদেশ যেমন পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ এইরূপ নানাভাগে বিভক্ত, নিম্ন ব্রহ্মদেশও তেমনি আরাকান, পেগু এবং তিনাসেরিম এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। এই নিম্ন ব্রহ্মের ভূমির পরিমাণ প্রায় সাতাশী হাজার মাইল।

পাহাড়, নদী, খাল

ব্রহ্মদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সাগরের নীল জল দিবানিশি নৃত্য করিয়া বেড়ায়, এইজন্য এখানে বৃষ্টি প্রায়ই হয়। যে দেশে বেশী বৃষ্টি হয়, সেই দেশে বেশী ফসল জন্মে, একথাটা তোমরাও

জান ; এইজন্য এদেশের গাঢ় নীল আকাশের ছায়ায় ফলে ফুলে ভরা তরুলতা, ফলে ফলে ভরা বড় বড় গাছ, সবুজ মকমলের মত ঘাসের শোভা, অপূর্ব্ব ও সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের মাঠে যেমন অগ্রহায়ণ মাসে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী মায়ের সোণার আঁচল দুলিতে থাকে, ব্রহ্ম-দেশেও তেমনি প্রচুর পরিমাণে ধানের ফসল হয়। আমরা যেমন ভাত খাইয়া বাঁচি, ব্রহ্মদেশের লোকের প্রধান খাদ্যও তেমনি ভাত। সেজন্য বর্ম্মনেরাও আমাদের মত ক্ষেতের সোণার ধানে বাতাসের দোলাদুলি দেখিয়া গাহিয়া থাকেন :—

'ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!'

ব্রহ্মদেশের উত্তর দিকে যোসো নামে একটী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এ পাহাড়ে কত যে বড় বড় গাছ আছে তাহার অবধি নাই। এ পাহাড়ের বুক হইতেই ব্রহ্মদেশের বড় নদী ঐরাবতী বা ইরাবতী নাচিয়া নাচিয়া নীচের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে। এ নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় এগারশ মাইল। ইরাবতী নদীকে কেহ কেহ আবার ঐরাবতীও বলেন। ঐ দেশে ইরাবতী ছাড়া আরও দুইটী

নদী আছে, তাহার একটীর নাম—সিত্তাং অপরটির নাম সালুইন্।

ইরাবতী, পাহাড়ের বুক হইতে নীচে নামিয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, এজন্য এই নদীর দুই তীরে ধানের ক্ষেত ও সমৃদ্ধ পল্লী অবস্থিত। ইরাবতী সাগরে মিশিবার আগে দশটী ধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়াছে। এই নদীর নানা শাখা প্রশাখার সহিত আবার বহু খাল আসিয়া মিশায় দেশটিকে সুজলা, সুফলা এবং শস্য শ্যামলা করিয়াছে।

জল বায়ু

এদেশের জলবায়ু বেশ ভাল। এদেশে মোটামুটি শীত ও বর্ষা এই দুইটি মাত্র প্রধান ঋতু। ব্রহ্মদেশে বৃষ্টি খুব বেশী হয়, সমুদ্রের ধারে ত অনবরতই বৃষ্টি হইয়া থাকে। সমুদ্রের কূলে যে সব দেশ, সে দেশে যেমন বৃষ্টি হয়, দেশের ভিতরের দিকে তেমন বেশী বৃষ্টি পাত হয় না। ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে এখনও ভীষণ জঙ্গল রহিয়া গিয়াছে, সে সব জঙ্গলা দেশের আশে পাশের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়।

ব্রহ্মদেশকে যে প্রাচীনকালে পৃথিবীর লোকেরা সুবর্ণভূমি বলিত, সেকথা প্রকৃতই সত্য। এদেশের

মাটির নীচে যে কত ধন, রত্ন লুকাইয়া আছে, তাহার অবধি নাই। ব্রহ্মদেশের খনিগুলি রত্ন গর্ভ। কোথাও হজ্‌দি নামক সুন্দর হরিদ্বর্ণের পাথর, কোথাও মর্ম্মর প্রস্তর, কোথাও নীলকান্ত ও পদ্মরাগমণি, কোথাও কেরোসিন তেলের খনি, আরো কত কি! আজকাল এসকল মণি, রত্ন, হীরা জহরতের সন্ধান হইতেছে, তেলের খনি হইতে তেল তুলিয়া দেশ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, এদেশের রাজার ক্ষমতা যখন অসীম ছিল, তখন রাজার আদেশ ছিল যে খনির ভিতর হইতে যে সকল মূল্যবান্ মণি, রত্ন পাওয়া যাইবে, তাহা কখনও বিদেশীর হাতে যাইতে পারিবে না। রাজার আদেশ থাকিলে কি হইবে? খনির ভার যাহাদের উপর ছিল, তাহারা ত বড় ভাল মানুষ ছিলেন না, যে সব দামি ভাল ভাল মণি, খনির মধ্যে পাওয়া যাইত, তাহার বেশীর ভাগই নিজেরা রাখিয়া দিতেন, কিংবা গোপনে গোপনে কোন কোন বিদেশী সওদাগরের কাছে বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থলাভ করিতেন। তবুও তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য

মণিরত্ন-ধনসম্পদ

হইবে যে—রাজার নিকট যে সব মণি যাইত তাহার দাম দুই লক্ষ টাকার কম হইত না।

'কোন দেশের তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল,
কোন দেশেতে চল্‌তে গেলে, দল্‌তে হয়রে দূর্ব্বা কোমল।'

একথা ব্রহ্মদেশের লোকেরা বেশ গৌরব করিয়াই বলিতে পারেন। এদেশের বনভূমি—রত্নপ্রসূ। একদিকে খাদ্য দ্রব্যের ফসলের মধ্যে যেমন এক ধানই একশ রকমের ফলে—তেমনি ব্রহ্মদেশের বনে যে সেগুন কাঠ হয় তাহাও এদেশের সৌভাগ্যের কারণ। ব্রহ্মদেশে এত বেশী ধান জন্মে যে সে দেশের লোকের খাওয়ার জন্য প্রচুর থাকিয়াও অনেক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

বড় বড় সেগুন গাছ জঙ্গলে কাটা হইলে, হাতী টানিয়া আনিয়া নদীর ধারে রাখিয়া দেয়, পরে বর্ষাকালে নদী দিয়া ভাসাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাঠ লইয়া যায়। এই কাঠ পৃথিবীর নানাদেশে চালান হইয়া থাকে। তামাকের চাষও এদেশে খুব হয়, কিন্তু বর্ম্মীরা এমনি তামাক খোরের জাত যে, দেশের তামাক খাইয়াও ইহাদের পিপাসা মিটেনা, তাহাদের তামাকের পিপাসা

মিটাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতেও তামাক চালান হয়।

উদ্ভিদ্ — তাল, ইক্ষু কলা, আরও নানা সুখাদ্য ফল এদেশে জন্মে। ব্রহ্মদেশে তালের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।

তোমরা পথে ঘাটে হয়ত ক্বচিৎ কখনও কোন ব্রহ্ম-প্রবাসী সৌখিন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে কিংবা ব্রহ্মদেশের লোকদের, এক অদ্ভুত রকমের ছাতা মাথায় দিয়া বেড়াইতে দেখিয়া থাকিবে। এসব ছাতা বাঁশের তৈরী। বর্ম্মণরা বাঁশ দিয়া ছাতা, কৌটা, পানের বাঁটা, পুতুল ও নানারূপ খেলার জিনিষ করেন। অন্যান্য গাছ-পালার মত এদেশে বাঁশও খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য নানা কার্য্যে এদেশের লোকেরা বাঁশের ব্যবহার করেন।

'ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায়' তোমাদের মধ্যে যাহারা ছেলেবেলায় স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ পড়িয়াছ, তাহাদের নিশ্চয়ই

জীবজন্তু — এ কথাটি বেশ মনে আছে। সত্যসত্যই এক সময়ে ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী মিলিত,

উবাবকী নদীব দৃশ্য।
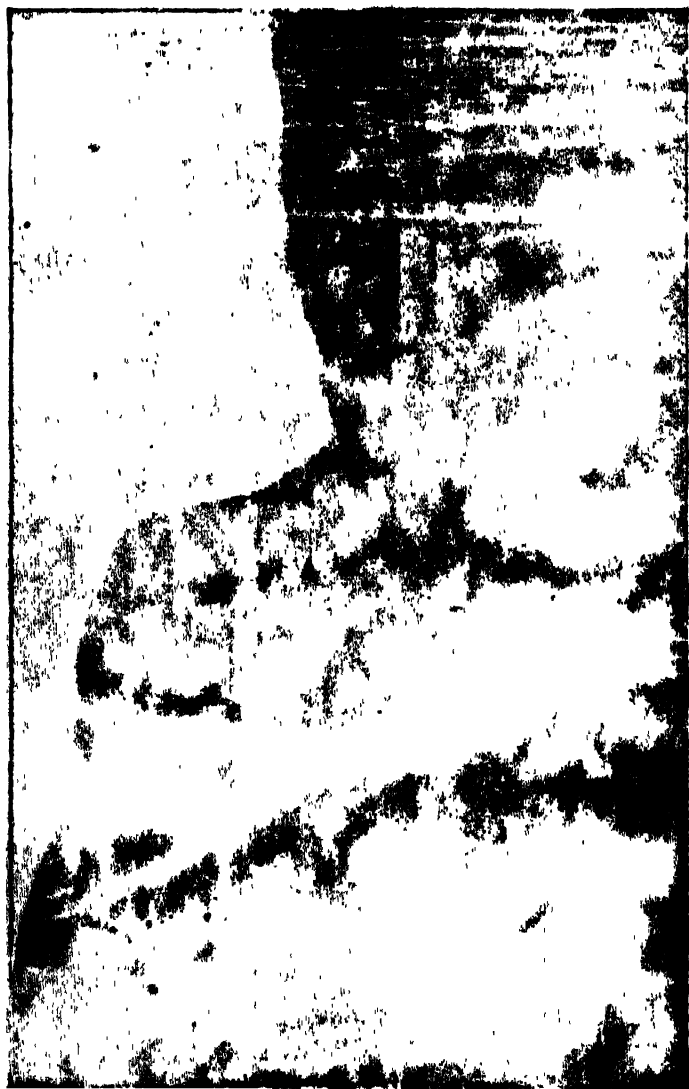
এখনও যে না মিলে তাহা নয়, তবে পূর্ব্বের মত আর পাওয়া যায় না।

এদেশের গভীর ঘন বনে অনেক বন্যজন্তুর বাস। সে সকলের মধ্যে বাঘ, চিতা বাঘ, ভালুক, এক খড়্গ, এবং দ্বি খড়্গ গণ্ডার, টাটুঘোড়া প্রচুর পাওয়া যায়। রাজহাঁস, পাতিহাঁস, কুক্কুর এদেশে বিস্তর।

এখন বোধ হয় তোমরা মোটামুটি দেশটী কেমন তাহার পরিচয় পাইলে,—এইবার অন্যান্য কথা শোন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস—রাজাদের কথা

'রাজ্যশাসন করিতে হইলে, একটু বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে হুকুম দিলে কি ভাল হয়না মহারাজ?'

রাজা নিন্দন্ মিন্ গর্জ্জিয়া কহিলেন,—'আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহিনা মন্ত্রী।'

'লুটদার'—সভার শাসনবিভাগের মন্ত্রী, রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, রাজ্যের কল্যাণ করিতে গিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু রাজার আদেশ কে অমান্য করিবে? পরদিন গোপনে মন্ত্রীকে হত্যা করা হইল, তাহার রুধির-সিক্ত মুণ্ড বধ্যভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

ব্রহ্মদেশে যখন স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন খাম্‌খেয়ালি।

স্বাধীন রাজার বিচার

বিচার-আচার কিছুই ছিলনা, যাহা খুসি তাহাই করিতেন, আজ যাহাকে ভালবাসিলেন, কাল তাহাকে বলিতেন,

তোমার মুখ দর্শন করিব না। 'মুখ দর্শন করিব না' কথাটার অর্থ ছিল বড় ভয়ানক। রাজারা সব বৌদ্ধ। অহিংসা হইতেছে তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহারা কি জীবহত্যা করিতে পারেন? প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া যে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই যদি কখনও কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন, অমনি বলিতেন,— 'আমি কাল আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।' রাজার পার্শ্বচরেরা বুঝিতেন যে বেচারার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, কাজেই বধ্যভূমিতে লইয়া যাইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া যাহাতে রাজার আর জীবনে ঐ ব্যক্তির কোন দিন মুখ দর্শন করিতে না হয় সে ব্যবস্থা করিতেন। রাজার এই সব খামখেয়ালি প্রাণদণ্ডের আদেশ পালিত হইল কিনা সে কথাও রাজার কাছে অতি বিচিত্র ভাবে জ্ঞাপন করা হইত। রাজা হয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে ব্যক্তি কেমন আছে?'.

অমনি সভাসদ্‌দের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিতেন— 'মহারাজ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও সাগরের রাজার, অপ্রীতিভাজন হইয়া বেচারা মনের দুঃখে মরিয়াছে।'

তোমরা গল্পে পড়িয়াছ—কোন্ সেই অজানা দেশের

এক রাজকন্যা এমন সুন্দরী ছিলেন যে তিনি হাসিলে মণি পড়িত, কাঁদিলে মুক্তা ঝরিত। ব্রহ্মদেশের রাজারাও ঠিক্ সেই অজানা দেশের রাজকুমারীর মত ছিলেন। তাঁহাদের যাহা কিছু ছিল, সমুদয়ই 'সুবর্ণ'। তুমি যদি কোন কথা রাজার নিকট বলিলে তাহা হইলে কি হইল জান? তোমার কথা সুবর্ণ কাণে শুনিলেন। রাজাকে একটী জিনিষ উপহার দিলে, যদি রাজা তাহা গ্রহণ করেন অমনি তোমায় বলিতে হইবে যে, "আমার পরম সৌভাগ্য যে সুবর্ণ উহা গ্রহণ করিয়াছেন।" একটী সুগন্ধি দ্রব্য রাজার প্রীতিকর হইয়াছে অমনি সভাসদেরা আনন্দে বলিয়া উঠেন, "সুবর্ণ নাসিকার উহা তৃপ্তি দান করিয়াছে।" যদি কেহ রাজ দরবার হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে লোকে গর্ব্বের সহিত বলিত "তিনি সুবর্ণ চরণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।" রাজা যদি কখনও রাজবাড়ীর বাহিরে যাইতেন, তাহা হইলে পথের দুই পাশে খুব উচু বেড়া দেওয়া হইত, পাছে লোকে রাজাকে দেখিতে পায়।

ব্রহ্মদেশের লোকেরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম

প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সে দেশের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ কেমন ছিল, সে সব কথা বমনদের অতি প্রাচীন ইতিহাস 'মহারাজা ওয়েঙ্গ' নামক পুঁথি হইতে জানা যায়। তোমরা সকলেই জান যে একদিন আমাদের এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষা ও সভ্যতা দান করিয়াছিল, কত দেশে দেশে ভারতের লোক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্মৃতি, সে গৌরব এখনও দেশে দেশে বিরাজিত। তাই বাঙ্গলার কবি গাহিয়াছেন—

ধর্ম্ম ও ইতিহাস

"সন্তান যাঁহার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

ব্রহ্মদেশে যে খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেবেরও জন্মিবার অনেক আগে শাক্য বংশের এক রাজা ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তিনি সেখানে তাগায়ুং নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরে শাক্য রাজার বংশের প্রায় চল্লিশ জন রাজা, একে একে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এদেশের নাম ব্রহ্মদেশ কেন? সে এক সুন্দর ইতিহাস। ভারতের বৌদ্ধেরা এক সময়ে পৃথিবীর সব দেশের

লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, এদেশেও প্রচারকেরা আসেন, তাহারাই প্রথম এদেশের লোকদিগকে ব্রহ্মা বলিয়া উল্লেখ করেন, তদবধি ব্রহ্মদেশের লোকেরা আপনাদের ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতানুসারে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মা হইতেই তাহারা সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করে। তাই তাহারা 'ব্রহ্মা' বা বর্ম্মা নাম লইয়াছে।

আপনার জাতি ও বংশের গৌরব করিতে সকলেই ভাল বাসে। ব্রহ্মদেশের রাজারাও আপনাদের জাতি ও বংশের গৌরব করেন। রামায়ণ ও মহাভারত পড়িলে তোমরা দুইটী শ্রেষ্ঠ রাজবংশের কথা জানিতে পার—একটী সূর্য্যবংশ, অপরটি চন্দ্রবংশ। অযোধ্যায় সূর্য্য-বংশের রাজধানী ছিল—আর হস্তিনাপুরে ছিল চন্দ্র-বংশের রাজধানী। সূর্য্যবংশের রামচন্দ্রের কথা সকলেই শুনিয়াছ। আর মহাভারতের সেই রাজা দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা তোমাদের অজানা নাই।

ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী যুগের সকল রাজা রাজড়ারাই আপনাদিগকে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশের বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ রাজারাও তেমান আপনাদের শাক্যবংশের বলিয়া পরিচয় দেন। শাক্য বংশ—সূর্য্য বংশের শাখা। ইক্ষাকু নামে রাজা এই সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের অনেকটা মিল দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে যেমন বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল, ছোট ছোট রাজা ছিলেন, কিন্তু তাহাদের কাহারও মনের মিল ছিল না, সদা সর্ব্বদা পরস্পরে ঝগড়া কলহ করিতেন,—ব্রহ্মদেশেও তেমনি অতি প্রাচীন কালে ছোট ছোট রাজ্য ও অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একতা বলিয়া একটা জিনিষই ছিল না—পরস্পরে মারামারি কাটা-কাটি করিতেন। যখন যিনি অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষা একটু বেশী ক্ষমতাশালী হইতেন, তখনই তিনি অন্য সকলের কর্ত্তা হইতেন। এইভাবে তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। সে সকলের মধ্যে এত বেশী অতি রঞ্জন আছে যে কোন কথাটি সত্য তাহা বুঝিতেই

পারিবে না। একজন রাজার হয়ত দশ হাজার সৈন্য ছিল, কিন্তু ইতিহাসে লিখিত আছে দশ লক্ষ। হয়ত তাঁহার যুদ্ধের হাতী ছিল এক হাজার, ইতিহাসে লিখিত আছে হাতী ছিল তাঁহার বিশ হাজার, এমন সব অলীকও অসম্ভব কথাই বেশী পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশে—কয়েকটি বিভিন্ন জাতি আছে। যথা ঃ—আরাকানী, পেগুই, তালায়িং (তৈলঙ্গী) বর্ম্মাওশান্। এই কয় জাতির মধ্যেই যুদ্ধ বিগ্রহটা খুব বেশী চলিত।

আমাদের ভারতবর্ষে যেমন মুসলমানেরা আসিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন ব্রহ্মদেশে কিন্তু সেরূপ হয় নাই। মুসলমানেরা কোন দিন এদেশে কোন অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মদেশের বিশেষত্ব। তবে একেবারে ব্রহ্মদেশে মুসলমানেরা আসেন নাই সে কথা ঠিক্ নহে। কুবলাই খাঁ নামে একজন মুসলমান রাজা এদেশে আসিয়াছিলেন। সেকালে পাগান সিন্ নামে একজন রাজা পাগান সহর নির্ম্মাণ করেন। পাগান এখন আর নাই উহার ধ্বংসাবশেষ শুধু পড়িয়া আছে। সে সব মঠ, মন্দির, পথ ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, এক

সময়ে যে পাগান কত বড় সমৃদ্ধ সহর ছিল, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

সে অনেক আগের কথা—পাগান যখন ব্রহ্মদেশের রাজধানী, সে সময়ে কুবলাই খাঁ নামে একজন মোগল, চীন দেশের সম্রাট হইয়াছিলেন। কুবলাই খাঁ তাতার দেশের দুর্দ্ধর্ষ মোগল বংশের লোক ছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল সাহস, তেমনি ছিল তেজ, বীর্য্য, তিনি মৃত্যুকে ভয় পাইতেন না। কুবলাই খাঁ নিজ শক্তি-প্রভাবে চীন দেশ জয় করেন, জাপান জয় করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। একদিন পাগান সহরে রাজধানীর দরবারে রাজা দরবার করিতেছেন, এমন সময়ে চীন দেশের দুই জন রাজদূত আসিয়া উপস্থিত হইয়া সম্রাট কুবলাই খাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রাজা গর্জ্জিয়া কহিলেন—"তোমাদের সম্রাটের এ অন্যায় অভিপ্রায়।"

"কিসে অন্যায় মহারাজ? ব্রহ্মদেশ বরাবর চীন-সাম্রাজ্যের অন্তঃভুক্ত, আপনি চীন সম্রাটকে রাজকর দিতে বাধ্য।"

ব্রহ্মদেশের স্বাধীন নৃপতির দেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখ, চোখ লাল হইয়া গেল। তিনি কহিলেন—"অসম্ভব! আমি চীন সম্রাটের অধীন নহি, আমি কোনরূপেই স্বাধীনতা বলি দিব না, তোমাদের সম্রাটকে বলিও যে আমি তাঁহাকে কোন রাজকর দিব না।"

চীন দূত ও ব্রহ্মের রাজা

চীন দূতেরা কহিলেন,—"আপনার এমন কি ক্ষমতা আছে যে আপনি চীন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন?"

"সে কথা তোমাদের কাছে বলিতে আমি বাধ্য নই।"

"নিশ্চয়ই বাধ্য।"

রাজা আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, চীনদূতগণের ধৃষ্টতা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি আদেশ করিলেন—"কে আছ, এখনি এই পাপিষ্ঠ, দুর্ব্বিনীত দূতদিগকে বধ্য ভূমিতে নিয়া হত্যা কর।"

চীনদূতেরা মনে ভাবিতে পারেন নাই যে অবধ্য দূতকে এইভাবে কোন রাজা বধ করিতে পারেন। কিন্তু শেষটায় তাহাই হইল, রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল।

বধ্যভূমি চীনদূতগণের শোণিতে রঞ্জিত হইল। মন্ত্রীরা কিন্তু রাজাকে এইরূপ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কথাটা ত আর গোপন থাকিবার নহে। চীন সম্রাট শুনিলেন, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—"চীনদেশ আক্রমণ কর।"

ব্রহ্মের রাজা নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এইবার একটা ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিবে। চীনদেশের মত বড় দেশ পৃথিবীর মধ্যে বড় একটা ছিল না। সেই দেশের লোক সংখ্যা যে কত তাহার সীমা সংখ্যা নাই। তারপর চীনদেশের লোকেরা কৌশলী, সাহসী এবং বীর যোদ্ধা, আবার মোগল তাতারের নেতৃত্বাধীনে তাহারা আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সৈন্য সংখ্যা ধন বল সবই ছিল ব্রহ্মদেশের রাজার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু স্বাধীনতা একটা জিনিষ যাহা চিরদিন দুর্ব্বলকেও সবল করিয়া তোলে। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজা পরাধীনতারূপ অপমানের জ্বালা সহ্য করা কোন রূপেই বরণীয় বলিয়া মনে করিলেন না। ব্রহ্মদেশেও রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

কুবলাই খাঁর সহিত বর্মণদের যুদ্ধে পরাজয়

যুদ্ধ বাঁধিল। ১২৮৩ সালে দুইপক্ষে যুদ্ধ হইল। একদিকে অসীম শক্তিশালী চীন সম্রাট্ সঙ্গে সুশিক্ষিত সৈন্যদল, আর একদিকে অশিক্ষিত বর্মণ সৈন্য। তবু তাহারা দলে দলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলি দিল। কুবলাই খাঁর জয় হইল—ব্রহ্মদেশের রাজা পাগান শেষটায় কিন্তু কাপুরুষের মত কাজ করিলেন, তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিলেন।

চীন সৈন্যেরা বিজয় রবে চারিদিক মুখরিত করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিল। নিরীহ নগরবাসীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতে লাগিল। সৈন্যেরা নগরের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ ভেদরূপ কোনও বিচার না করিয়া বধ করিতে লাগিল। ধন, রত্ন যাহা মিলিল তাহাই চীন সৈনিকেরা লুঠিয়া লইল। নগরবাসীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। নগর পরিত্যক্ত শ্মশানে পরিণত হইল। এইভাবে পাগান সহর একযুগের ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ, শত সহস্র জনগণের বাসস্থান একেবারে বিজন বনে পরিণত হইল। সেই পাগান সহর এখনও আছে, শত শত বাড়ী পড়িয়া আছে, কোন কোন

বাড়ী বৃহৎ সুন্দর, নানা কারুকার্য্য শোভিত, এখনও বেশ নূতনেরই মত আছে. কিন্তু এখন আর এস্থানে লোক জনের বাস নাই।

ব্রহ্মদেশের আলাম্প্রা নামক রাজার বংশধরেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন সম্রাট্ কুব্লাই খাঁ ব্রহ্মদেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্রহ্ম দেশ চীন-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। কাজেই আবার ব্রহ্মদেশে পেগু, আরাকানী, তালায়িং, বর্ম্মাওশান রাজারা ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহারা পূর্ব্বে যেমন ঝগড়া কলহ করিয়া সর্ব্বদা লড়াই করিতেন, সে ভাবটা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল। একটা খুব বড় ঝড় বহিয়া গেলে যেমন গাছ পালা, বাড়ী ঘর সব উল্‌টাইয়া পাল্টাইয়া যায়, আবার গাছ গজাইতে অনেকটা সময় লাগে তেমনি কুবলাই খাঁর ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়নে ব্রহ্মদেশের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে সহজে আর কাহারও মাথা তুলিবার জো ছিল না। যেখানে কাহারও শক্তি নাই, সকলেই দুর্ব্বল সেখানে লড়াই কিরূপে হইতে পারে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলাম্প্রা নামে একজন লোক নিজ ক্ষমতা প্রভাবে ব্রহ্মদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিহাসটি বড় সুন্দর, তোমাদের কাছে তাঁহার গল্প বলিতেছি।

আলাম্প্রার কথা

আবা নামক ব্রহ্মদেশের একটী নগর হইতে বহুদূরে আলাম্প্রার জন্ম হয়। আলাম্প্রা ছিলেন এক ব্যাধের সন্তান। তাঁহার পিতা মাতা বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকার করিয়া ও তাহা বিক্রয় দ্বারা অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আলাম্প্রারও যখন বেশ একটু বয়স হইল, তখন পিতা মাতার কাছে তীর ধনু ছুড়িতে, ও শিকার করিতে শিখিলেন। শাল, সেগুণ, তমাল, তাল প্রভৃতি ঘনবনের ছায়ায়, লতা পাতা ও কাঁটা ঘেরা শিল পাথরে ঢাকা পাহাড়ের গা বাহিয়া চলা ফিরা করিতে করিতে আলাম্প্রার ভয় জিনিষটা যে কি তাহা একেবারেই ছিল না। বালক আলাম্প্রার খর্ব্বদেহে সবল মাংস পেশী, চোখ দু'টাতে তীব্র জ্যোতিঃ ও নির্ভীকতা, মাথায় বড় বড় ঝুঁটি বাঁধা লম্বা চুল—পীতবর্ণ এই বালকটির ললাটে বিধাতা পুরুষ অপরূপ এক লাবণ্যের জ্যোতিঃ মাখাইয়া

দিয়াছিলেন। আলাম্প্রার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে নিজ গ্রামের সমবয়স্ক ছেলেরা তাহাকে দলের কর্ত্তা করিয়া লইয়াছিল। সে যাহা বলিত বা করিত, তাহাই তাহারা মানিয়া চলিত। এইভাবে তাহার দলে বহু সমবয়সী সাহসী ছেলে জুটিয়া গেল। আলাম্প্রা তাহাদিগকে লইয়া বনে বনে এক সঙ্গে শিকার করিতে যাইতেন, তাহারাও একজন সাহসী ও নির্ভীক দলপতি পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইয়াছিল। কিছুদিন বাদে আলাম্প্রার পিতা মাতার মৃত্যু হইলে, সে আপনাকে গ্রামের কর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিল। কেহ তাহাকে আর বাধা দিল না। আলাম্প্রা সকলকে বলিয়া দিলেন—"তোমাদের আর কাহাকেও কর দিতে হইবে না, তোমরা স্বাধীন, শুধু আমাকে কর দিলেই চলিবে!

কথাটা পেগু রাজার কাছে যাইয়া পৌঁছিল, তখন দরবার হইতে কর সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্ম-চারী আসিলেন। রাজার কর্ম্মচারী সে—ক্ষমতা তাঁর অসীম, তিনি কেন এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহী ব্যাধকে ভয় করি-বেন? কর্ম্মচারী আলাম্প্রাকে ।কিয়া পাঠাইলেন। আলাম্প্রা চল্লিশ জন সাহসী অস্ত্রধারীসহ পেগুর রাজার

কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়াই বলা নেই কহা নেই অমনি তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেন। এতবড় আস্পর্দ্ধা! রাজকর্ম্মচারী কিনা আলাম্প্রাকে ডাকিয়া পাঠায়!

আলাম্প্রা রাজকর্ম্মচারীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এ সংবাদ যখন রাজদরবারে যাইয়া আবার পৌঁছিল, তখন কয়েকজন সাহসী সৈনিক আলাম্প্রাকে দমন করিবার জন্য আবা হইতে প্রেরিত হইল। আলাম্প্রা সব সংবাদই রাখিতেন। কোন্ পথে আবার লোকজন তাহাকে ধরিয়া লইবার জন্য আসিবে, সে পথটা তাহার অজানা ছিল না,—একটা গভীর বনের ভিতর দিয়া পথ, আলাম্প্রা তাহার দল বল লইয়া তীর ধনু হাতে করিয়া সেই বনের ভিতর ঝোপ ঝোপের আশে পাশে লুকাইয়া রহিলেন। আবার লোকজনেরা নির্জ্জন বনপথে বেশ আরামের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে, সে সময় বর্ষার ধারার মত তীরের পর তীর আসিয়া তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, একে একে সকলেই প্রাণ হারাইলেন। ঐ গভীর ঘন বনের পথে পালাইবার কোন উপায়ইত ছিল না, এইভাবে একজনেরও জীবনরক্ষা

আলাম্প্রার পেগু রাজার সহিত যুদ্ধ

হইল না, একে একে সকলেই প্রাণ হারাইল। ব্যাধ বীর আলাম্প্রার অসাধারণ সাহসিকতায় দেশের অনেক লোকই তাহার সঙ্গী হইল। রাজা আবার আর একদল সৈন্য পাঠাইলেন, আলাম্প্রা তাহাদিগকেও হারাইয়া দিলেন। পুনঃ পুনঃ রাজার সৈন্যদের হারাইয়া দেওয়ায় আলাম্প্রার মনেও আত্মশক্তিতে খুব বিশ্বাস হইল। তাহার মনে হইল আমিত ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দেশের রাজাও হইতে পারি। এ সময়ে আলাম্প্রা 'আয়াঙ্গজিয়া' উপাধি লইলেন। 'আয়াঙ্গজিয়া' শব্দের অর্থ বিজয়ী বীর।

'আলাম্প্রা' নামও তাঁহার অনেক পরে হয়। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ম্মনরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। 'আলাম্প্রা' শব্দের অর্থ হইতেছে ভাবিবুদ্ধ—পালিভাষায় ইহার মানে হইতেছে বোধিসত্ত্ব। এই নাম তাঁহার কেন হইল? এবিষয়ে বেশ একটী সুন্দর গল্প বলিতেছি।

একদিন রাত্রিকালে 'আলাম্প্রা' তাহার দলবল লইয়া এক বনের মধ্যে আড্ডা গাড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আলাম্প্রাও একটী বড় গাছের তলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা একজন সঙ্গী দেখিল, আলাম্প্রার হাত দু'টীতে আগুণ জ্বলিতেছে। কি আশ্চর্য্য! মানু-

যের হাতে কেমন করিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে পারে? দাউ দাউ করিয়া দু'টী হাতেই আগুন জ্বলিতেছে, অথচ 'আয়াঙ্গাজিয়া' গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বেচারা, দলপতির হাতে আগুণ জ্বলিতে দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিল, পরে তাহার অন্যান্য সঙ্গীদিগকে জাগাইয়া তুলিল, তাহারাও ঐরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া অবাক্ হইল! একজন বলিল,—"হায়! হায়! সর্ব্বনাশ, দলপতির হাতে আগুণ লাগিয়াছে, এখনি যে পুড়িয়া মরিবেন। কি করা যায়? সকলে পরামর্শ করিয়া তখন 'আয়ঙ্গজিয়া'র দুই হাতে জল ঢালিয়া সে আগুণ নিভাইয়া দিল। এদিকে আয়ঙ্গজিয়ার ঘুম ভাঙ্গিলে দেখা গেল যে তাঁহার হাত দুইটী সম্পূর্ণ অক্ষত রহিয়াছে। এই ব্যাপারটায় সঙ্গীদলেরা তাঁহাকে কোন দেবতার অবতার বলিয়া মনে করিল, একজন জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া এই অদ্ভুত বার্ত্তার কথা বলিলে, তিনি বলিলেন যে—'আয়ঙ্গাজিয়া' পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। এই জন্মে তিনি দেশের রাজা হইবেন। এই একটী ঘটনার পর হইতেই সঙ্গিগণ

তাঁহাকে আলাম্প্রা নামে সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল যে, ইনিই দেশের রাজা হইবেন।

আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস এবং সাধনার বলে পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। আলাম্প্রার সঙ্গীগণের তাঁহার উপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং বিশ্বাস হইল যে তিনি নিশ্চয়ই দেশের রাজা হইবেন। পরে কিন্তু তাহাই ঘটিয়া গেল। তাহার সঙ্গীরা আলাম্প্রার জন্য রাজবাটীর ন্যায় এক বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। তারপর দলে দলে লোক মিলিত হইয়া যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র রণতরী সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই ভাবে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্য ও নৌবহর লইয়া আবা নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। আলাম্প্রা দৈবশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ একথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই আলাম্প্রা পেগু রাজধানীতে আসিতেছেন শুনিয়া দেশের চারিদিকে একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। পেগুর রাজা ও তাঁহার সেনাপতি প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিলেন। আলাম্প্রা একপ্রকার বিনা যুদ্ধে রাজধানী অধিকার করিলেন। জ্যোতিষীর কথা সত্যে

আলাম্প্রা দেব অবতার

পরিণত হইল। এই ঘটনার কয়েক বৎসরের পর দেখিতে দেখিতে আলাম্প্রা একেবারে ব্রহ্ম দেশের রাজা হইলেন। ছোট ছোট রাজ্য ও রাজা আর রহিল না আলাম্প্রা একেবারে রাজচক্রবর্ত্তী নৃপতি হইলেন।

আলাম্প্রা মানুষ ছিলেন অতি বড় বুদ্ধিমান এবং কৃতজ্ঞ। তিনি রাজা হইয়া কাহারও কোন ক্ষতি করিলেন না। বিশেষতঃ দীন দরিদ্র অবস্থায় যে সঙ্গীর দল তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল—সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল, সম্পদ-লাভে তাহাদিগকে কোনরূপ বঞ্চিত না করিয়া উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত পূর্ব্বক তাহাদেরও বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইলেন। আলাম্প্রা খুব জাঁকজমক ভালবাসিতেন। তিনি প্রাচীন নগর হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া রেঙ্গুন সহরে স্থাপন করেন। ইংরেজদের সহিত বর্ম্মণ রাজার পরিচয়ও আলাম্প্রার সময়েই হইয়াছিল।

আলাম্প্রা রাজা হইবার পর ব্রহ্ম দেশের পাশাপাশি যে সব দেশ আছে, তাহা জয় করিবার ইচ্ছা করিলেন।

শ্যামদেশের রাজার সহিত যুদ্ধ

শ্যাম দেশ ব্রহ্ম দেশের সংলগ্ন। শ্যামদেশে একদল দস্যু তস্কর বাস করিত, তাহারা ছিল বড় দুর্দ্দান্ত,ব্রহ্মদেশের সীমান্তবাসী

লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া লুঠ তরাজ ও উৎপীড়ন করিয়া পলাইয়া যাইত। এই ডাকাতের দল এমন চতুর ছিল যে তাহাদিগকে বর্মণরা জব্দ করিতে পারিতেন না। পাহাড় পর্ব্বত ও বনজঙ্গল পরিপূর্ণ অজানা পথ দিয়া তাহারা আসা যাওয়া করিত, কাজেই তাহাদিগকে ধরা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। আলাম্প্রা শ্যামদেশের রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"মহাশয়! আপনি—আপনার দেশের ঐ সব দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের শাসন করুন, নতুবা আমি ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব।"

শ্যামদেশের রাজারা বরাবরই স্বাধীন, তাঁহারা বর্মন রাজার কথায় ভয় পাইবেন কেন? তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"এ ত বেশ মজার কথা! আপনি যদি পারেন দস্যুদিগকে ধরিয়া শাস্তি দিন্, আমার কথার অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আমার বিশ্বাস আপনার এই অভিযোগ মিথ্যা, কারণ শ্যামদেশের প্রজারা খুব ভাল, পাপ ও অধর্ম্মের ধার তাহারা ধারে না। আলাম্প্রার এখন একটু গর্ব্ব হইয়াছিল, শ্যামরাজার এই উত্তরে তাঁহার খুবই রাগ হইল, কিন্তু এমন একটা সামান্য ঘটনা লইয়া, যুদ্ধ করিতে গেলে যে তাহারই অপমান! এজন্য

তিনি আর একটি কৌশল করিলেন,—তিনি শ্যাম-রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

শ্যাম রাজা অস্বীকার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ব্রহ্ম দেশের বর্ব্বরগণের সহিত শ্যাম-রাজকুমারীর বিবাহ কোন দিনই হয় নাই, হইতেও পারে না। আলাম্প্রার এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠানটা নেহাৎ মূর্খতার কারণ হইয়াছে।

শ্যাম রাজার এই উত্তরে আলাম্প্রা অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন। তিনি শ্যাম রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শ্যামরাজাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আলাম্প্রা সাহসী, বীর এবং সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন, কাজেই যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয় লাভ করিতে করিতে শেষ-বার শ্যামের রাজধানীর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। শ্যাম রাজা হতাশ হইয়া পড়িলেন, বুঝি বা তাঁহার মান, অভিমান, গর্ব্ব সব ভাসিয়া যায়! কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইলেন। এখানে শিবির স্থাপনের কিছু দিন পরেই আলাম্প্রা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজার

সঙ্গে বেশ ভাল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিরাশ হইয়া কহিল—"মহারাজ! আপনার জীবন সংশয় ব্যাধি হইয়াছে, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।" রাজাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এইবার আর তাঁহার রক্ষা নাই, যদি মরিতে হয়, তবে আর শত্রুর দেশে মরি কেন? তিনি আদেশ দিলেন সৈন্যগণ দেশে ফিরিয়া চল।

যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে বর্মন সৈন্যদের প্রাণে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল—শ্যামদেশ জয় করিবার আনন্দে তাহাদের হৃদয়ে যে উৎসাহ জাগিয়াছিল, সে সমুদয় লোপ পাইল। সৈন্যগণ পিছু হটিতে লাগিলেন, রাজাকে অতি সন্তর্পণে ডুলিতে করিয়া লইয়া চলিল, কিন্তু আলাম্প্রা আর জীবিত অবস্থায় রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। সৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল। সত্যসত্যই রাজা আলাম্প্রাকে বর্মণরা খুব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই। রাজধানীতে লইয়া যাইয়া অত্যন্ত সমারোহের সহিত রাজার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা ও ঐশ্বর্য্যের সহিত আলাম্প্রার

দেহ দাহ করা হইয়াছিল। রেঙ্গুন সহরে আজও আলাম্প্রার সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সমাধি-ভবন বিরাজিত আছে।

রাজা আলাম্প্রা ব্রহ্মদেশের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়া যাইবেন, এবং মনের মত করিয়া রাজধানী সাজাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন মাত্র বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া তেমন কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রাজা আলাম্প্রার চরিত্র কথা

আলাম্প্রা প্রজাবৎসল ছিলেন বটে, কিন্তু শত্রুর প্রতি ভাল ব্যবহার করিতেন না। একবার এজজন তাইলঙ্গি রাজা তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল, ইহাতে আলাম্প্রা তাঁহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। যুদ্ধে তাইলঙ্গি রাজা হারিয়া বন্দী হইলেন। আলাম্প্রা বন্দী রাজাকে ক্ষমা ত করিলেনই না, বরং তাঁহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিলেন। সেই জীবন্ত সমাধির উপর একটি প্যাগোডা বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মন্দিরটি এখনও বিরাজিত আছে।

আলাম্প্রা রাজবংশের দশজন রাজা একে একে ব্রহ্ম
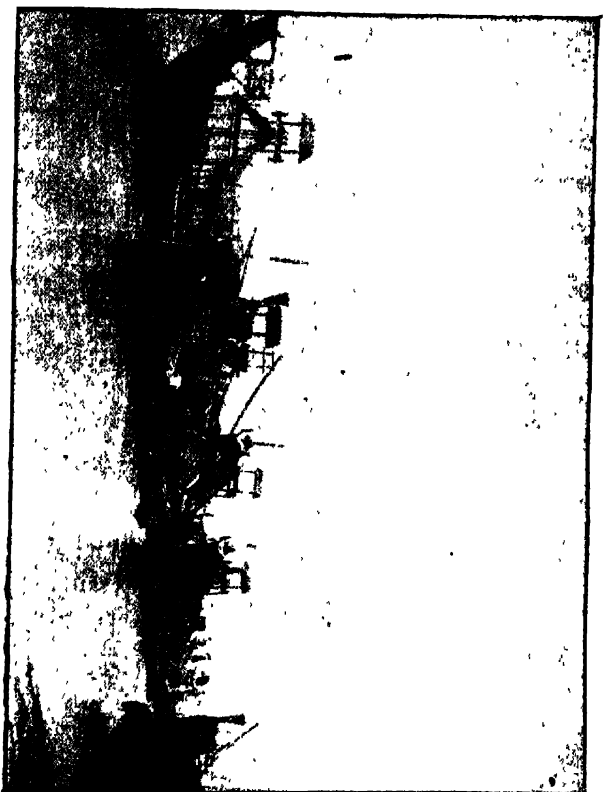
ব্রহ্মদেশের নৌকা।

দেশের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন—এই বংশের শেষ রাজাদের সময়ই ব্রহ্মদেশ ইংরেজেরা অধিকার করিয়াছিলেন। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদের নাম লিখিলাম। আলাম্প্রা নাউঙ্গ দগি, চিং-কাই বা উপাইজা মাউঙ্গলৌক ঐ দ্বিতীয় পুত্র। মিঙ্গুমিন—(মাউঙ্গলেকের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। পাওঙ্গোজা। বাগিদ। থারা ওয়াদীমিন্। পাগানমিন্। মিন্দন্‌মিন্। থিবোমিন্।

আজকাল জাপান পৃথিবীর মধ্যে এত উন্নত কেন জান, তাহার প্রধান কারণ জাপানীরা নানা দেশবিদেশে যাতায়াত করিয়া নানাদেশের নূতন জ্ঞান, নূতন শিক্ষা, নূতন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতি শিক্ষা করিয়া আপনাদের দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাই 'অসভ্য জাপান' আজ পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছেন। স্বাধীন বর্মনরাও যদি ঐভাবে দেশবিদেশে যাতায়াত করিতেন, রাজারা খাম্-খেয়ালি না হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের কোনদিকেই অভাব হইত না—বুঝি বা তাঁহারাও আজ পৃথিবীর

একটা বড় জাতিতে পরিণত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাত আর হইল না।

বর্মন রাজারা একদল তোষামুদের দলে বসিয়া রাজ্য চালাইতেন। খামখেয়ালি যে কি রকম ছিলেন তাহার একটু নমুনাও তোমরা পাইয়াছ। রাজদরবারে খোসামুদিটা যে কি রকম চলিত এইবার সেকথাও একটু শোন। একজন বলিলেন,—"মহারাজ! জাপান-দেশের রাজা বড় বীর!" অমনি চারিদিক্ হইতে তোষামুদের দল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মিথ্যাকথা, মহারাজ! সে দেশের রাজা একটা শিয়াল!" আর একজন বলিলেন,—"কুকুর! আমা-দের মহারাজ হইতেছেন সিংহ, পৃথিবীর অন্য সব দেশের রাজারা সব শেয়াল, কুকুর, ভেড়া, গরু, ছাগল!" রাজা এই তোষামোদ বাক্যে একেবারে গলিয়া গেলেন—তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। অমনি সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"সুবর্ণ আনন্দিত হইয়াছেন।" রাজাকে তাহারা যে শুধু তোষামুদী করিয়া অতুল ক্ষমতাশালী বলিতেছে, প্রকৃত পক্ষে যে তিনি

তাহা নন্ একথা তিনি ভুলেও একবার ভাবিতেন না!

একবার বাগিদ নামে একজন বর্মন রাজার খেয়াল হইল যে বাঙ্গলাদেশ, আসাম ও মণিপুর জয় করিবেন। তখন ইংরেজেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আধিপত্য করিয়া বসিয়াছেন। ইংরেজ দেশের রাজা। ইংরেজের যে কত শক্তি আছে তাহা বর্মন রাজা বাগিদ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহার খেয়াল হইল যে 'ইংরেজের বাহুতে কত বল একবার তাহার পরীক্ষাটা করিতেই হইবে। সেনাপতি বান্দুল সত্যসত্যই একজন বীরপুরুষ ছিলেন। বাগিদ সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"সেনাপতি! আমি দিগ্বিজয়ী বীর আলম্প্রার বংশধর, আমিও তাঁহার ন্যায় বীরত্বে অদ্বিতীয় হইতে চাই, কেমন বাঙ্গলা মুলুক, আসাম ও মণিপুর জয় করিতে পারিবেত?' এত বড় রাজার সেনাপতি তাঁহার মুখে যদি "না কথাটা বাহির হয়, তাহা হইলে সে যে বড় দারুণ অপমানের কথা! তিনি সগর্ব্বে কহিলেন,—"সুবর্ণের আদেশ

আসাম ও মণিপুর আক্রমণ

পালন করিবার জন্য এ গোলাম নিয়ত বাধ্য।”

‘তবে তাহাই হউক, সৈন্য লইয়া যাও আসাম এবং মণিপুর রাজ্য সকলের আগে জয় কর।”

সেনাপতি বিনীতভাবে তেজের সহিত কহিল,—“সুবর্ণের আদেশ-বাণী অচিরে সম্পন্ন হইবে।”

এখানে তোমাদের কাছে ব্রহ্মদেশের রাজারা কিভাবে রাজ্যশাসনসংরক্ষণ করিতেন, সেকথাটা বলিয়া লই। রাজা থাকিলেই তাঁহার মন্ত্রী থাকে, বর্মন রাজাদেরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী থাকিতেন। এক শ্রেণীর মন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল শুধু রাজবাড়ীর মধ্যে, রাজবাড়ীর বাহিরে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের যত কিছু ক্ষমতা প্রতিপত্তি সব ছিল রাজবাড়ীর মধ্যে। রাজার সংসার—রাজবাড়ীর ব্যয় নির্ব্বাহ এসকল কাজ তাঁহারা দেখিতেন। আর একদল মন্ত্রী ছিলেন তাঁহারা শাসনকার্য্য চালাইতেন। কিরূপে রাজ্যের শাসন হইলে ভাল হয়, কি হইলে রাজস্ব সংগ্রহ হয় এসব নানাদিক্ তাঁহাদের দেখিতে হইত। এই মন্ত্রীরাই বিচার আচার সব কাজ করি-

রাজ্যশাসন প্রথা

তেন, রাজা নামে মাত্র সভাপতি থাকিতেন। মন্ত্রী সভার নাম ছিল—লুট' দা। যদি রাজা নিজে কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ কিংবা রাজপরিবারের অন্য কেহ রাজার পরিবর্ত্তে সভাপতির কাজ করিতেন।

এই সভায় চতুর্দ্দশ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী থাকিতেন। ইহার মধ্যে মোট চৌচল্লিশজন কর্ম্মচারী থাকিতেন। সকল কর্ম্মচারীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম ছিল অঙ্গিরা। কাহারও কাহারও নাম ছিল উন্ মানে বাহক, হিন্দুস্থানী কথায় সর্দ্দার বলিলে যেমন বুঝায়, উন্ শব্দেও তাহাই বুঝাইত। আর একজন প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ছিল উঙ্গি। উঙ্গি যে সে লোকে হইতে পারিত না। রাজ্যের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তাঁহাকেই উঙ্গির পদ প্রদান করা হইত। উঙ্গি ছিলেন একাধারে সেনাপতি, রাজস্বও বিচার বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কর্ত্তা। তাঁহার অধীনে আর একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন—তিনি অশ্বারোহী সৈন্যগণের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। আর সাধারণ বিচারক তহশিলদার প্রভৃতির উপর 'আথেম্মুন্' নামে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন।

এই সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণের সহায়তা যাহারা করিতেন, তাহাদের নাম ছিল উন্দার্ত্তক্। কোন ও ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারীরূপে গৃহীত হইবার জন্য মনোনীত হইলে, তাহাঁকে কতকগুলি বিষয়ে শপথ করিতে হইত। সেই শপথগুলি প্রথমে কাগজে লিখিয়া কোনও প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমার নিকট একজন কর্ম্মচারী পড়িয়া যাইতেন, আর যিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার ঐ কর্ম্মচারীটির সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া যাইতে হইত। এখানেই কিন্তু সব শেষ হইয়া গেল না, ঐ কাগজখানি পড়া হইয়া গেলে, সেখানি পোড়াইয়া এক বাটি জলের মধ্যে রাখিয়া উহা ধনুক, বড়শা, তরবাল, কামান এবং বন্দুক স্পর্শ করাইয়া সেই জল কর্ম্মচারীকে পান করিতে দিত। কেমন অদ্ভুত নিয়ম বুঝিলেত !

রাজ্য নানা ভিন্ন ভিন্ন জেলা ও নগরে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলায় এক একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তাহারা যেমন খুসি, তেমনি খেয়াল মতে রাজ্য শাসন করিতেন, রাজদরবারে নিয়মিত ভাবে রাজস্ব পৌছিলেই হইত, তাহা হইলে আর কোন হাঙ্গাম

হইত না। প্রজাদের ঘর, বাড়ী বদলাইয়া মার পিট্‌ করিয়া যে ভাবেই হউক অর্থ-সংগ্রহ করাই ছিল এক-মাত্র তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। সকল শাসন কর্ত্তারাই যে অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নহে, কেহ কেহ খুবই ভাল ছিলেন, তাহারা প্রকৃত বৌদ্ধধার্ম্মিক ব্যক্তির ন্যায় অহিংসা পরমধর্ম্ম মানিয়া লইয়া অতি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে জিলা বা প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তবে সাধারণতঃ প্রায় সকল শাসনকর্ত্তারাই ভাল ছিলেন না।

"অদৃষ্ট" এই কথাটা যেমন ব্রহ্মদেশের রাজাদের আমলে খাটিত, এমন কোন দেশে কোন কালে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। একজন রাস্তার মুটেও সময় সময় রাজার কৃপা বলে হয়ত রাজমন্ত্রী হইলেন, আবার এমন দিন আসিল, রাজা তাহার সহিত পথের কাঙ্গালের মত ব্যবহার করিলেন। রাজা বা রাণীর অনুগ্রহলাভ করিতে পারিলে, যে কোন ব্যক্তি মন্ত্রী, সেনাপতি, জেলা বা দেশের শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন। এজন্যই বলিয়াছি যে ব্রহ্মদেশে বড়, ছোট হওয়া সবই নির্ভর করিত রাজা রাজড়াদের খামখেয়ালীর উপর।

একবার একজন অতি সামান্য ভৃত্য অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে এই ভৃত্যটি রাজার পাদুকা বাহক ছিল, রাণীর চায়ের বাটী ও পানের কৌটা বহন করিত, শেষে সে রাজার কৃপাদৃষ্টিতে পাড়য়া একেবারে রাজ্যের একজন প্রধান সভাপতির পদ পাইয়াছিলেন। থিবোরাজার অনুগ্রহে তাঁহার একজন সাধারণ ভৃত্যও এক সময়ে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে আবার রাজরোষে পড়িয়া তাঁহাকে পথে সাধারণ মজুরের কাজ করিয়া শেষটায় জীবন দিতে হইয়াছিল।

এক একজন রাজা এক এক অদ্ভুত স্বভাবের ছিলেন! থারাওয়াদি নামে একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার হাতে সর্ব্বদাই একটী বড়শা থাকিত। খাইতে, শুইতে, দরবার করিতে কোন সময়েই তিনি বড়শাটি হাত ছাড়া করিতেন না। হয়ত কেহ এমন একটী কাজ করিল যাহা রাজার মনের মত হইল না, অমনি রাজা বড়শার আঘাতে তাহার প্রাণ বধ করিলেন! রাজার হাতে প্রতিবৎসর এমন শত শত নিরীহ লোকের প্রাণ গিয়াছে! রাজার এইরূপ খামখেয়ালি হত্যার গতি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না; বরং
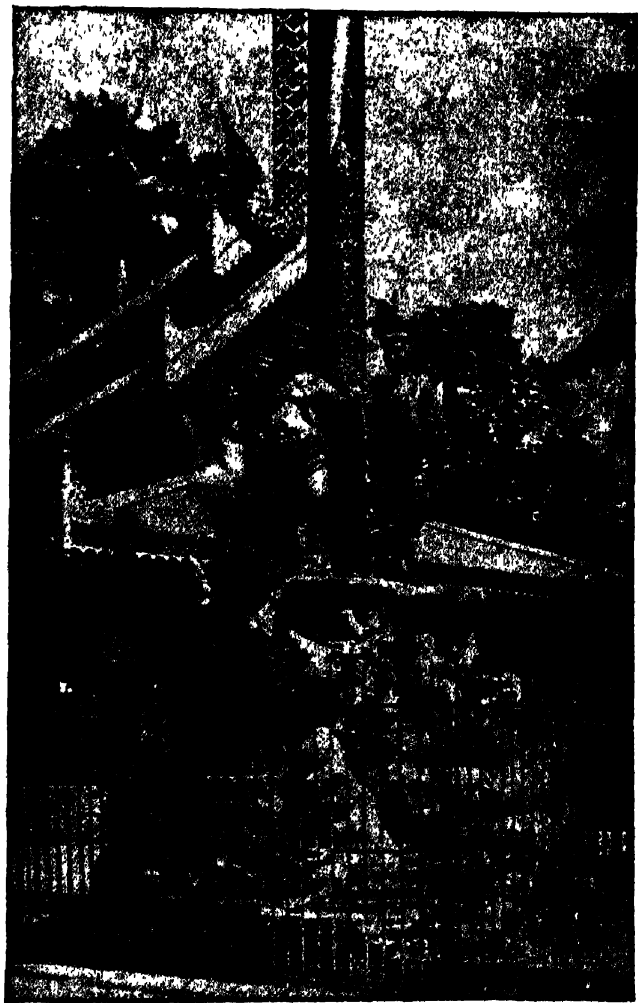
সিউদাগোন প্যাগোদার কয়েকটি মূর্ত্তি।

রাজা যখনই এইভাবে কাহাকেও হত্যা করিতেন, তখনি মন্ত্রীর দল বলিয়া উঠিত আহা! এই লোকটা কত বড় ভাগ্যবান্! সুবর্ণের হাতে প্রাণ হারাইয়া একেবারে স্বর্গে চলিয়া গেল! মানুষ অন্যায় করিয়া আর কয় দিন শান্তিতে কাটাইতে পারে? শেষটায় রাজা থারাওয়াদি উন্মাদ হইয়াছিলেন।

তোমরা অনেকেই "জিজিয়া" করের নাম শুনিয়াছ। আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজাদের উপর এই করটা বসাইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে কিন্তু এইরূপ একটা কর, বরাবরই প্রচলিত ছিল। এমন গৃহস্থ ছিল না, যিনি এই করের হাত হইতে রেহাই পাইতেন। প্রত্যেক গৃহস্থকে গর্ পরতায় দশ টাকা করিয়া কর দিতে হইত। এই কর দিতে কিন্তু কোন বর্মনই আপত্তি করিতেন না। বংশপরম্পরায় এইরূপ কর দিয়া আসিতে আসিতে তাহাদের নিকট ইহা আর তেমন নূতন বা আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া মনে হইত না। বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে যে পরিমাণ কর দিতে হইত, অবিবাহিতদিগকে তাহার অর্দ্ধেক দিলেই চলিত। স্ত্রীলোক এবং অসহায় দুঃস্থ ব্যক্তিরা এই করের হাত হইতে রেহাই পাইতেন।

এই সব রাজস্ব ইত্যাদি ছাড়া আরও নানারূপে রাজা কর আদায় করিতেন। তুমি বাস করিবার জন্য ঘর তৈরী করিবে, রাজকর না দিয়া কি সাধ্য আছে যে ঘর তৈরী কর। তুমি একখানি দামি কাপড় পরিবে, কিংবা মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিবে, নিশ্চয়ই তোমার অবস্থা ভাল, তবে রাজাকে ঠকাইবে কেন? রাজাকেও কিছু কর দাও। ব্রহ্মদেশের আকাশ, বাতাস, মেঘবৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম, ফুলফল, ফশল সকলই যে রাজার। সাগর যে ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, নদী যে রূপার মত সাদা জল লইয়া বড় ছুটিয়া চলিয়াছে, সে কাহার অধীনে? রাজারত! তবে তুমি যদি রৌদ্র, বৃষ্টি, গ্রীষ্ম, বর্ষার হাত এড়াইবার জন্য কিছু একটা কর, সেজন্য কেন রাজাকে কর দিবে না? না দেওয়াটাই অন্যায়। এই সব কারণে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উপর এমন কি ছাতা ব্যবহারের জন্য ও রাজাকে কর দিতে হইত।

কোন গৃহস্থ ইচ্ছা করিলেই যে দশটা ছাতি ব্যবহার করিবেন, তাহা পারিতেন না। কি আকারের ছাতা, কি উহার বর্ণ, কোন্ গৃহস্থের বাড়ী কয়টি ছাতা থাকিবে, সে সব ও রাজা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সাদা ছাতি

রাজা ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। রাজার নয়টি ছাতা থাকিত। রাজছত্র সবই হইত সাদা। রংকরা বা গিল্টি করা ছাতা যার তার ব্যবহার করিবার অধিকার ছিল না।

রাজার সন্তোষজনক কোন কার্য্য করিলে যেমন এক এক দেশে এক এক প্রকার উপাধি বা পুরস্কার দেওয়া হয়, তেমনি ব্রহ্মদেশের রাজা যদি কাহারও উপর সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাতা উপহার দিতেন। রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত, সুদক্ষ সেনাপতি, রাজপুত্র এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে নানা রকমের ছাতা উপহার দিতেন। তাঁহাদের কাহারও ছাতার ভিতরটা থাকিত কালো, কাহারও বা থাকিত রেশম দিয়া মোড়া, কেহ বা ঝালর লাগাইবারও অনুমতি পাইতেন।

যাহারা দীন দরিদ্র ও গরিব তাহাদের ছাতার আকার, বাঁট, সবই ছোট হওয়া চাই। ছাতার রং ও তাহারা ইচ্ছামত করিতে পারিত না। ছাতার সম্বন্ধে রাজদরবার হইতে কত রকমের যে বিচিত্র নিয়ম জারি হইত তাহার সীমা সংখ্যা ছিল না। যদি কেহ রাজার আদেশ মত ছাতার নিয়ম মানিয়া না চলিতেন, তাহা

হইলে তাহার প্রাণদণ্ডও হইত। প্রথম প্রথম ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশের স্বাধীন রাজাদের সময় ছাতার এই সব বিচিত্র হ্যাঙ্গামে পড়িয়া বিব্রত হইতেন।

এইত গেল ছাতার কথা। তার পর বাসন কোসনের অদ্ভুত বিধি ব্যবস্থার কথা শোন।

আমাদের খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা প্রত্যেক বিষয়ে ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। থালা, ঘটি, বাটি, পানের বাটা, পিক্‌দানি ইত্যাদি কত যে তাহা আর কত বলিব। সব দেশেই লোকে ইচ্ছামত এসব জিনিষপত্র কেনা বেঁচা এবং ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মদেশে এ বিষয়েও মানুষের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। রাজ দরবার হইতে হুকুম লইয়া তবে এ সকল জিনিষপত্র তৈরী করিতে হইত। কোন্ ধাতু দিয়া কত বড় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সোণার অলঙ্কার সম্বন্ধে ও এই নিয়ম খাটিত। কেহ রাজ দরবারের অনুমতি না লইয়া এ সকল অলঙ্কার পত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। রাজ বাড়ীর ছেলে মেয়েরা ভিন্ন যদি কেহ সোণার মল ব্যবহার করিত, তাহা হইলে

তাহার প্রাণদণ্ড হইত। জরির কাজ করা রেশমী কাপড় পরিতে কাহারও কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ যে বর্মনরা স্বাধীন জাতি—স্বাধীন রাজার অধীন হইয়াও কত ক্লেশে, কত অধান-তার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিত।

এইবার তোমরা স্বাধীন ব্রহ্মদেশের বিধি ব্যবস্থা আইন কানুন রীতিনীতির বিষয় অনেকটা জানিতে পারিলে। এইবার সেই যে রাজা বাগিদের কথা বলিয়াছি, তাঁহার কথা শোন। তিনি ত সেনাপতি বান্দুলকে বলিলেন—আসাম ও মণিপুর জয় কর,—সেনাপতি বান্দুলও ভাবিলেন আমি যদি কোনরূপে আসাম ও মণিপুর জয় করিতে পারি,—সৈন্যদল ও আমার অধীনে, সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাইত আমার হাতে থাকিবে, হয়ত একদিন আমিও ব্যাধ বালক আলম্প্রার মত একটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারি। তার-পর একবার এই যে শ্বেতাঙ্গজাতি আসিয়া ভারতবর্ষটা অধিকার করিয়া বসিল, একবার ইহাদের বল-পরীক্ষা করিয়াই বোঝা যাক্ না, জাতটা কেমন! বিবাদ বাঁধাইবার জন্য সেনাপতি বান্দুলার আদেশে কতকগুলি

বর্মন সৈন্য প্রথমে আসামের সীমান্ত প্রদেশ হইতে কতিপয় ব্রিটিশ প্রজাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। এবং উহার অল্পদূরে শাপুরি নামক একটা স্থানে ইংরেজদের একটী ক্ষুদ্র সৈন্যের ছাউনি ছিল, সেখানে বড় বেশী সৈন্যসামন্ত থাকিত না। বান্দুলা— ইংরাজদের এই সৈন্য ছাউনিটি আক্রমণ করিয়া সেই সৈন্যদের ও বধ করিলেন। ইংরেজদের এ সময়ে ব্রহ্ম-দেশের রাজার সহিত কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। এই হাঙ্গামটা যাহাতে শুধু ক্ষতিপূরণ লইয়াই নিষ্পত্তি হইয়া যায় এজন্য ইংরেজ পক্ষ হইতে কয়েকবার বর্মন রাজার নিকট চিঠিপত্র লেখালেখি চলিল, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না। ব্রহ্মের রাজা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন,—ভাবিলেন—"কুচ্ পরোয়া নেই," ইংরেজরা ভয় পাইয়াছে।

বারবার রাজাকে জানাইয়া—অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন ইংরেজেরা বুঝিলেন যে ব্রহ্মদেশের রাজা তাহাদের কথা শুনিবেন না। তখন যুদ্ধের ব্যবস্থা হইল। এই যে যুদ্ধের সূত্র-পাত হইল,—এজন্য কোন্ পক্ষ প্রথম দোষী ছিলেন,
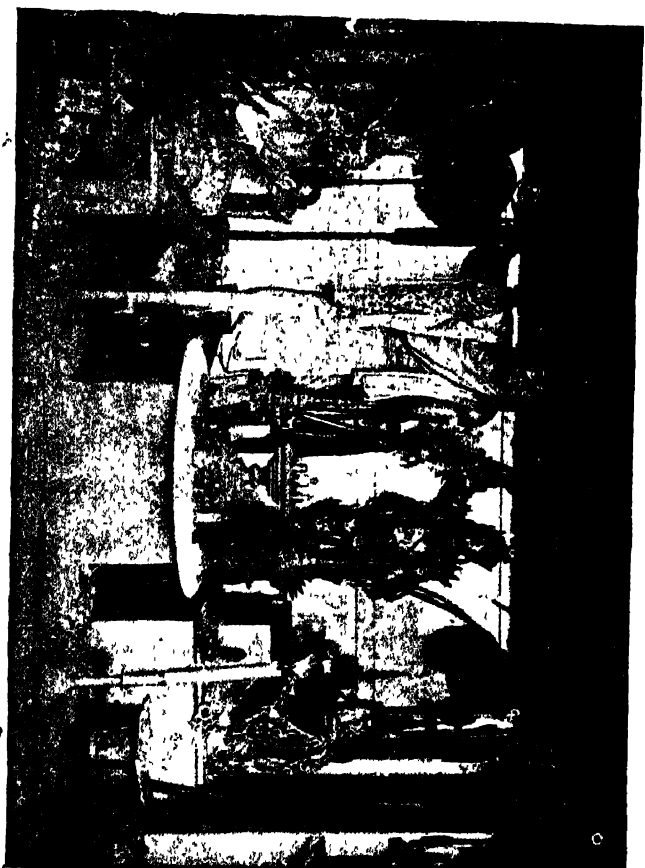
সিউলনাথ—সিউল প্যাগোদা।

তাহা লইয়াও কিন্তু মতভেদ আছে, সে কথাটাও এখানে বলিয়া দিলাম।

ইংরেজরাজের আদেশে স্যার আর্চবল্ড ক্যাম্বেল নামে একজন সাহসী ব্রিটিশ সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জাহাজ সাজাইয়া ১৮২৪ সালের ১০ই মে তারিখে রাজধানী রেঙ্গুনের নিকট যাইয়া নঙ্গর ফেলি-লেন। সংবাদটা রাজা শুনিয়াও শুনিলেন না। তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল সেনাপতি বান্দুলার উপর। বান্দুলা কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিতেছিলেন। রাজা যখন বান্দুলাকে ডাকিয়া কহিলেন—"বান্দুলা, ইংরেজরাত ইরাবতীর কূলে নঙ্গর করিয়াছে, এখন উপায় কি? তোমরা কি যুদ্ধ করিবে, না ক্ষতিপূরণ দিয়া ইংরেজের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবে?' বান্দুলা কি স্ববর্ণের কাছে খাটো হইতে পারেন? তিনি পূর্বের ন্যায় গর্ব্বভরে কহিলেন—"আমি জীবিত থাকিতে স্ববর্ণের কোন আশঙ্কা নাই, স্ববর্ণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিবেন।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতি বান্দুলাকে স্ববর্ণকারু-কার্য্য খচিত রাজপ্রাসাদ-স্বরূপ ছত্র উপহার দিলেন।

ব্রহ্মদেশও চীনদেশের কাঠের কাজের জন্য বিখ্যাত। সে দেশের বাড়ী ঘর, মঠ মন্দির সকলই কাঠের তৈরী। এমন কি রাজপ্রাসাদও কাষ্ঠ নির্ম্মিত। সে দেশের কেল্লা-যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামও অনেকটা কাঠের তৈরী ছিল। কামান, বন্দুকের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। সেনাপতি ক্যাম্বেল—শেষবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে পুনরায় রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, দূত তাঁহার নির্দ্দেশ মত রাজাকে বলিল, 'মহারাজ! এখনও যদি আপনি আমাদের ক্ষতিপূরণ দেন, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হই। রাজার সেই এককথা আমি ক্ষতিপূরণ দিব না।' কাজেই যুদ্ধ যে অনিবার্য্য হইয়া পড়িল, সে কথা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার।

গুড়ুম্ গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামানের ধ্বনি ব্রহ্ম-দেশে সর্ব্বপ্রথম বাতাসের গায় ভাসিতে ভাসিতে সর্ব্বত্র ইংরেজের সহিত যুদ্ধের কথা প্রচার করিয়া দিল। ইংরেজ গোলন্দাজদের কামানের গোলা লাগিয়া রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী বম নদের কাঠের তৈরী দুর্গ দাউ দাউ করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কেল্লা পুড়িয়া ভষ্মাবশেষে পরিণত হইল।

কেল্লার মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, যে যেখানে পারিল দৌড়াইয়া পালাইল। যুদ্ধের একটা অভিনয় মাত্র হইল। আবা হইতে সৈন্য আসিল—কিন্তু ইংরেজের কামানের সম্মুখে তাহাদের সমুদয় আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। পদে পদে বর্ম্মনরা পরাজিত হইল। এদেশের জলবায়ু ইংরেজ সৈন্যদের সহ্য না হওয়ায় তাহারাও অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেনাপতি বান্দুলা কিন্তু এদিকে বেশ একটু কৌশলের কাজ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন যে যদি কৌশল করিয়া ব্রিটিশ-ভারতে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বেশ সুবিধা হইবে। এজন্য তিনি আরাকানের পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রায় দশ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজাও তাঁহার এই অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া সর্ব্ব-ভাবে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরেজেরা যদি বান্দুলার এই কৌশলটুকুই না বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তাহারা সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এত বড় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না। সেনাপতি ক্যাম্বেল একদল সেনা রেঙ্গুনে রাখিয়া, অপর

একদল সেনা লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ডুনাবুনামক একটা স্থানে সেনাপতি বান্দুলার সহিত ইংরেজ সেনার সংঘর্ষ হইল, সেই সংঘর্ষে বান্দুলা সহসা কামানের গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। ডুনাবুনে বর্ম্মনদের আশাভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল। বর্ম্মনরা ইংরেজদের পরাক্রমের কাছে হার মানিয়া গেল—এই-বার রাজা এবং মন্ত্রীগণ বুঝিতে পারিলেন যে অসাধারণ বীর জাতি ইংরেজের সহিত বিজয়লাভ অসম্ভব।

আসামের ভিতর যে একদল ইংরাজসৈন্য প্রবেশ করিয়াছিল, বান্দুলার সেই কৌশলও তখন আর খাটিল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিলেন। আরাকাণ সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজের করতলগত হইল।

দেশের সর্ব্বত্র তখন ইংরাজদের নামে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতি দূর গ্রামের কুটিরে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে বর্ম্মন কৃষকেরা ও জন সাধারণে গল্প করিত যে—'দেশে সাদা দৈত্য হানা দিয়াছে, এই দৈত্যেরা রক্ত বীজের ঝাড়, মরিলেও বাঁচিয়া উঠে। কেহ বা বলিল, যে কোন দিন যুদ্ধ দেখে নাই, যুদ্ধের ব্যাপার কি তাহাও বোঝে না, "আরে ভাই আমি নিজ চক্ষে

দেখিয়াছি, একটা সাদা দৈত্যের মাথা কাটিয়া মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহা গজাইয়া উঠিয়াছে। কেহ বলিত সাদা ইংরেজদের সহিত শেষ যুদ্ধে বর্ম্মনরা হারিয়া গেলেন।

বর্ম্মার রাজা এ সময়ে সন্ধির জন্য দুইজন মার্কিন মিশনারিরা সহিত কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী দিয়া পাঠাইলেন। এই দুইজন মার্কিন ভদ্রলোক খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মের রাজা বরাবরই তাহাদের প্রতি খাম্‌খেয়ালি ব্যবহার করিয়াছেন। যখন খেয়াল হইত, তখনই ইঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন, আবার তাহা রোধ করিতেন। কত বার কত কষ্টে যে তাহাদের কারাগারে দিন কাটিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারাগারে অনাহার ও নির্য্যাতন সহিয়াও তাহারা আপনাদের ধর্ম্মের বিশ্বাস হারান নাই। রাজা দেখিলেন যে এই শ্বেতাঙ্গ দুইজনকে এখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া ইংরেজ দরবারে পাঠাইলে অনেক কাজ হইবে। এই দুই-জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের নাম ছিল জড্‌সন ও প্রাইম্‌—ইঁহারা দুই জনেই বর্ম্মন ভাষা জানিতেন, ইহারা যেমন

পারিতেন ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে, তেমনি পারিতেন ঐ ভাষায় লেখা পড়া করিতে।

ইহাদের দ্বারা কথাবার্ত্তা চালাইয়া ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বান্দুবা নামক স্থানে ইংরেজের সহিত সন্ধিপত্র লিখিত হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নগদ এক কোটি টাকা, আসাম, আরাকানা ও তিনিসেরিম উপকূল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন,—সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ম্মনদের পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে হইল। এক বৎসরের মধ্যে বাকী টাকা দেওয়ার সর্ত্ত স্থিরীকৃত হইল। টাকার জামিন স্বরূপ রেঙ্গুন সহর ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

এইভাবে কয়েক বৎসর বেশ শান্তিতে কাটিয়া গেল। ইংরাজের সহিত কোন গোলই বাঁধিল না। কিন্তু ১৮৩৭ সালে থারাওয়াদী নামে একজন রাজা যখন সিংহাসনে বসিলেন তখন গোল বেশ ভাল ভাবেই বাঁধিয়া উঠিল। থারাওয়াদী ছিলেন অতি বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, ইংরেজদিগকে তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ইংরজের কথা, ইংরেজের

প্রশংসা তিনি একেবারেই শুনতে পারিতেন না। তাঁহার এত বড় ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল যে রাজধানী আবা নগরে যে ব্রিটিশরাজ-দূত থাকিতেন, তাঁহার মুখদর্শনও করিতেন না।

থারাওয়াদীর মরণের পর তাঁহার ছেলে পাগানমিন্ হইলেন রাজা। পাগান্‌মিনও পিতার নিকট হইতে ইংরেজ বিদ্বেষ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে বর্ম্মনরা নানা ভাবে ইংরেজদিগকে অপমানিত করিতেন, জাহাজের খালাসি—ইংরেজের আশ্রিত কর্ম্মচারী, সকলের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি ইংরেজ দূতকেও অপমানিত করিয়া রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতে ভীষণ ফল ফলিল। কেন রাজা পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতির সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া এইভাবে ইংরেজ রাজদূতকে অপমানিত করিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলে, রাজা ইংরেজ-দূতকে বলিলেন—"তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, আমার স্বাধীন দেশে, আমি দেশের স্বাধীন রাজা, আমার রাজধানীর বুকের উপর তোমা-

দের দূত থাকিবে কেন ?” ইংরেজ দূত বলিলেন—“তবে আপনি কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন ?”

“হ’ক যুদ্ধ—ক্ষতি কি ?”

ইংরেজদূত এইরূপ কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা বেশ।”

এই সময়ে লর্ড ড্যালহৌসি ছিলেন ভারতের বড় লাট। লর্ড ড্যালহৌসি—ব্রহ্মদেশের রাজার এ অন্যায় ভাবে ইংরেজ বণিক্‌দের প্রতি অপমান, দূতকে অপমান-সূচক বাক্য প্রয়োগ সহ্য করিলেন না। তিনি ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ড্যালহৌসি ইংরেজ সেনা পাঠাইয়া রেঙ্গুন, পেগু, প্রোম প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান জয় করিয়া লইলেন, ব্রহ্মরাজ সন্ধির কোন প্রস্তাব করিলেন না, কাজেই এগুলি কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা শেষবার কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা সহরে, ড্যালহৌসির নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। লর্ড ড্যালহৌসি বেশ ভদ্রতার সহিত দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—“আপনি কি সংবাদ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ?”

দূত কহিল—“আমাদের মহারাজা, আপনার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী।”

“কোন্ বিষয়ে তিনি অনুগ্রহ ভিখারী ?”

“আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া পেগু তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে মহারাজা পরম বাধিত হইবেন।”

লর্ড ড্যালহৌসি হাসিলেন, হাসিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—“যতদিন আকাশে সূর্য্য চন্দ্র উদিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পেগুর দুর্গ-শিরে ব্রিটিশ পতাকা পত্ পত্ করিয়া আকাশে উড়িবে।” দূত বিষণ্ণ মনে দেশে ফিরিয়া গেল।

এই ঘটনায় রাজা মিন্দমিয়ান প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। এদিকে রাজ্যের মধ্যে, একদল লোক রাজার ভয়ানক শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল রাজ্যের এই অশান্তি ও উৎপাতের জন্য দায়ী রাজা মিন্দমিয়ান, এজন্য তাঁহারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। আবার আর একদল লোক রাজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা রাজার সম্বন্ধে কোন কথা

উঠিলে বলিতেন—"দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রাখিবার জন্য রাজা যাহা করিয়াছেন, তাহা স্বাধীন রাজার মত হইয়াছে। কিন্তু শত্রুদল প্রবল হইয়া রাজাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিল।

রাজা পায়ংইয়ন্ নামক একজন রাজকুমারকে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন, থিব-মিনও এক জন রাজকুমার ছিলেন। এই রাজকুমারের মাতা ছিলেন এক শান-রাজকুমারী। তিনি চরিত্রহীনা ছিলেন কাজেই রাজকুমার থিব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভাল ছিল না। রাজা মিন্দমিন্ কিছুদিন ঐ রাজ-কুমারীকে কারাগারে আট্কাইয়াও রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষটায় তাঁহার মৃত্যুর পর একদল মন্ত্রীর সহায়তায় মিন্দমিনের আদেশ ও মনোনয়ন ব্যর্থ হইয়া থিবই ব্রহ্মদেশের রাজা হইয়াছিলেন।

এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের আব্-হাওয়া অনেকটা বদ্লাইয়া গিয়াছিল। সেখানে ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মার্কিন ধর্ম্মযাজকেরা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও বিদ্যালয় স্থাপন করিতে

ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর, রাজামিন্দামিয়ানের বড়রাণী থিবকেই মনোনীত করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, এসময়ে থিবর বয়স বেশী ছিল না।

রাজা থিব এ সময়ে রাজধানীর একটী মিশনারী বিদ্যালয়ে যাইয়া ইংরেজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ক্রিকেটও খেলিতে পারিতেন, রাজা হইবার পূর্ব্বে থিব বৌদ্ধ মঠে বসে করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ন্যায় তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র থাকিত। পাটরাণীর একটী মাত্র কন্যা ছিল, সেই কন্যার নাম ছিল সুপ্যালং বা সুপেয়ালাট। থিবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া থিবকে রাণী মন্ত্রীগণের সহায়তা লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। এইভাবে থিব হইলেন ব্রহ্মদেশের রাজা।

পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসেই রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি লইয়াই যত গোলযোগ হইতে দেখা যায়। রাজ্যলাভের জন্য পুত্র পিতাকে, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাইতে ইতস্ততঃ করেন না, এমন কাহিনী তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অনেক পড়িয়াছ।

রাজা হইয়া থিব পাটরাণী ব্যতীত, অন্যান্য রাণীদের পুত্র, কন্যা সকলকে অতি নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিয়া-

ছিলেন। হতভাগ্য নির্দ্দোষ রাজকুমার ও কুমারীরা বড়ই কাতর স্বরে প্রাণ-ভিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু হায়! বজ্রের মত কঠিন হৃদয়, রাজার প্রাণে বিন্দুমাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না! গল্প আছে যে ঐ দলের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে যখন হত্যার জন্য ঘাতক তরবারি উত্তোলন করিয়াছিল, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"থিব আর এমন কি নূতন কিছু করিল, আমাদের যে মরিতে হইবে, তাহাত অজানা ছিল না।" হত্যাও অতি ভীষণ ভাবে করা হইয়াছিল,—কাহারও বা গলা টিপিয়া, কাহাকেও বা লাঠি দিয়া ঠেঙ্গাইয়া কাহাকেও ফাঁসি লট্‌কাইয়া এমনি সব নানা ভীষণ নিষ্ঠুরতার সহিত নিরীহ বেচারাদের খুন করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

তোমরা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে যে প্রায় আট খানা গরুর গাড়ীতে করিয়া ঐ সব মৃতদেহ কতক গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলা হইয়াছিল, কতক বা নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ অমানুষিক ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, রাজা কেন এইরূপ নিষ্ঠুর

হত্যা কার্য্য করিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তরে রাজা বলিলেন যে—"তোমরা আপনাদের চরকায় তেল দেও গিয়ে বাপু! আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমি স্বাধীন রাজা, আমার রাজ্যের সুখ সুবিধা ও শাসন-সংরক্ষণের জন্য আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।"

মান্দালয় এ সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। এখানে সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী একজন ব্রিটিশ রাজদূত থাকিতেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজার এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহারে যার পর নাই রাগিয়া গিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট রাজদূতকে আদেশ করিলেন,—"তুমি এখনি ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আইস।" ব্রিটিশ রাজদূত মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।

অবিবেচক রাজা পরম খুসী। তিনি উপস্থিত মন্ত্রীসভার সভ্যদিগকে কহিলেন—"দেখিলেত, ইংরেজেরা আমাকে কেমন ভয় করে। মন্ত্রীসভার সভ্যগণের মধ্যে অনেকে ইহার পরিণামটা যে কি ভীষণ হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এমনি ছিল তাহাদের ভয় যে মুখ ফুটিয়া সে কথা কেহই বলিলেন না, বরং

সকলেই কহিলেন—"সুবর্ণ, যাহা করিয়াছেন, তাহাই বেশ হইয়াছে।"

তোমাদের কাছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সময় ইংরেজ বণিকেরা ব্রহ্মদেশে নানাপ্রকার বাণিজ্য ব্যবসায়েও লিপ্ত ছিলেন, সে সকল ব্যবসায়ের মধ্যে সেগুণ কাঠের ব্যবসায় ছিল সর্ব্ব প্রধান। "বম্বেবরমা-ট্রেডিং কোম্পানী" নামে একটী কোম্পানী এ সময়ে ব্রহ্মদেশে কাঠের কারবার করিতেন। ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট হইতে তাঁহারা বনভূমির ইজারা লইয়াছিলেন। কিছুদিন বাদে রাজা তাহাদের হিসাব পত্র দেখিয়া মনে করিলেন যে কোম্পানী তাঁহাকে ঠকাইতেছেন! এইজন্য রাজা কোম্পানীর কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষার জন্য একদল বিচারক নিযুক্ত করিলেন। বিচারকেরা উক্ত কোম্পানীর হিসাব নিকাশ দেখিয়া রায় দিলেন যে কোম্পানী রাজাকে ঠকাইতেছেন। রাজার আদেশে ব্রহ্মদেশের বিচারকগণের নিকট কোম্পানীর বিচার হইল, বিচার করিয়া, তাঁহারা কোম্পানীর চব্বিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন।

কোম্পানী নিরুপায় হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট

মীমাংসার প্রার্থী হইলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও মধ্যস্থ হইয়া গোলযোগটা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সম্মত হইলেন, এবং রাজাকেও সে কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন—“এ ত বড় চমৎকার কথা! আমার রাজ্যের ব্যাপার, আমি বিচার মীমাংসা করিলাম, তাহার উপর তোমরা কথা কহিবার কে? আমি তোমাদের কথা মানিতে রাজি নই।” ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজার এই উদ্ধত বাক্যে যারপর নাই অপমান বোধ করিলেন।

যুদ্ধ ঘটিবার আর একটা কারণও এই সময়ে উপস্থিত হইল। রাজা থিব ওদিকেও বেশ চতুর চালাক ছিলেন, তিনি দেখিলেন যে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, কিন্তু অত বড় শক্তিশালী একটা জাতির সহিত অশিক্ষিত বর্ম্মনসৈন্য লইয়া জয়লাভ অসম্ভব। কাজেই অন্য কোন একটা সমান ক্ষমতাশালী জাতিকে যদি ইহার ভিতর টানিয়া আনা যায় তাহা হইলে বেশ ভাল হয়। এজন্য তিনি গোপনে গোপনে দূত পাঠাইয়া ফরাসীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরেজদের কাছে, রাজার এই গোপন ষড়-

যন্ত্রের ব্যাপারটা গুপ্ত রহিল না, তাহারাও এমন একটা ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে সেজন্য মনোযোগী হইলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পুনরায় রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনার রাজধানীতে একজন ইংরেজ দূত থাকিবে, আপনি তাঁহার সহিত পরামর্শ এবং তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া কোন বিদেশী রাজার সহিত কোন রাজনৈতিক বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না। আপনি শীঘ্র ইহার উত্তর দিন্।

ব্রহ্মদেশের অন্যান্য রাজারা যেমন ইংরেজদের বরাবরই বিদ্বেষী ছিলেন, থিব যে তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী ছিলেন, তাহা তোমরা তাঁহার আচার ব্যবহার হইতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। থিব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোন লিখিত উত্তর না দিয়া মুখে বলিলেন যে—"আমি আপনাদের কথা রাখিতে রাজি নই।"

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একে একে তিনবার রাজা থিবের নিকট হইতে অপমানজনক ব্যবহার পাইয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জেনারেল প্রেণ্ডারগষ্ট নামক ইংরেজ সেনাপতি এইবার রাজা থিবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

যিনি মুখে এত বড় বড় বীরত্বের কথা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ব্রিটিশসৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকে যেমন তৃণ ভাসিয়া যায়, তেমনি সেই সৈন্যদল ইংরেজ সৈনিকের কামানভেরীর গর্জ্জনের সহিত যে কোথায় উধাও হইয়া গেল, তাহার আর কোন চিহ্ন রহিল না। রাজধানী মান্দালাতে যখন সেনাপতি প্রেণ্ডারগষ্ট আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁহার নিকট নগরবাসীরা বিনা ওজর আপত্তিতে আত্মসমর্পণ করিল।

রাজা থিব নগর হইতে বাহির হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। রাজা ও রাণী ইংরেজের হাতে বন্দী হইলেন। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির বাঙ্গলা জয়ের মত ইংরেজেরাও বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে ব্রহ্মদেশ জয় করিলেন। একটী বন্দুকের শব্দও শোনা গেল না, একটী কামানও গর্জ্জিল না। কামান বন্দুকের কালো ধোঁয়া সুন্দর নীল গগনের উজ্জ্বল দীপ্তির মাঝখানে বিন্দুমাত্রও কালিমা আনিয়া দিল না।

রাজা থিব ও রাণী সুপেয়ালাট বন্দী হইয়া প্রথমে মান্দ্রাজের অন্তঃর্গত বেলোয় নগরে ছিলেন, পরে তাহা-দিগকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের রত্নগিরি নামক স্থানে রাখা হইয়াছিল। এমনি করিয়া ব্রহ্মদেশ আপ-নার স্বাধীনতা হারাইল। ইংরেজের সিংহমূর্ত্তি-লাঞ্ছিত ব্রিটিশ পতাকা আকাশে উড়িল। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তঃর্ভুক্ত হইল। আর রাজা থিব আর বাঁচিয়া নাই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত ব্রহ্মদেশের শেষ স্বাধীনতার গৌরব স্মৃতি ডুবিয়া গেল। সেদিন হইতে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা হারাইয়া অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

প্রথমে ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের প্রথম কমিশনারের নাম চার্লস বার্ণার্ড। বার্ণার্ডের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কমিশনাররাই শাসন সংরক্ষণ করিতেন, পরে সেখান-কার শাসনকর্ত্তারা লেফট্‌নান্ট গভর্ণার নামে অভিহিত হইতেন, আজকাল যেমন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশে গভর্ণার নামে এক একজন শাসনকর্ত্তা দেশ শাসন করিতেছেন, ব্রহ্মদেশও এখন গভর্ণারের শাসনা-

ধীন। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান গভর্ণারের নাম স্যার হার-কোর্ট বাটলার। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় এখন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, রেল গাড়ী, ডাকঘর, টেলীগ্রাফ প্রভৃতি সমুদয়ই প্রতি-ষ্ঠাপিত হইয়াছে। জাহাজে চড়িয় তিন চারি দিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশে পৌঁছিতে পারা যায়। ভারতের নানা জাতির লোকেরাই এখন সেখানে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া পরমানন্দে বাস করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মদেশ—বৌদ্ধ ধর্ম্ম

'উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার'
আজিও যুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণতঃ চরণে যাঁর'।

যে অর্দ্ধজগৎ মহাত্মা বুদ্ধের মহান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল ব্রহ্মদেশ তাহার মধ্যে একটি সর্ব্ব প্রধান। কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, এখানে সে ইতিহাস বলিতেছি। বুদ্ধদেব নিজে যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তিনি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে নাই।

বহু বৎসর পরে অশোক নামে ভারতবর্ষের একজন রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে প্রচারক পাঠাইলেন, নানাস্থানে মুর্ত্তি, মঠ, মন্দির স্তূপ স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধ-প্রচারকেরা কেহ গেলেন সিংহল, কেহ গেলেন চীন, কেহ গেলেন জাপান,

কাদো প্যাগোদার উত্তরভাগ।
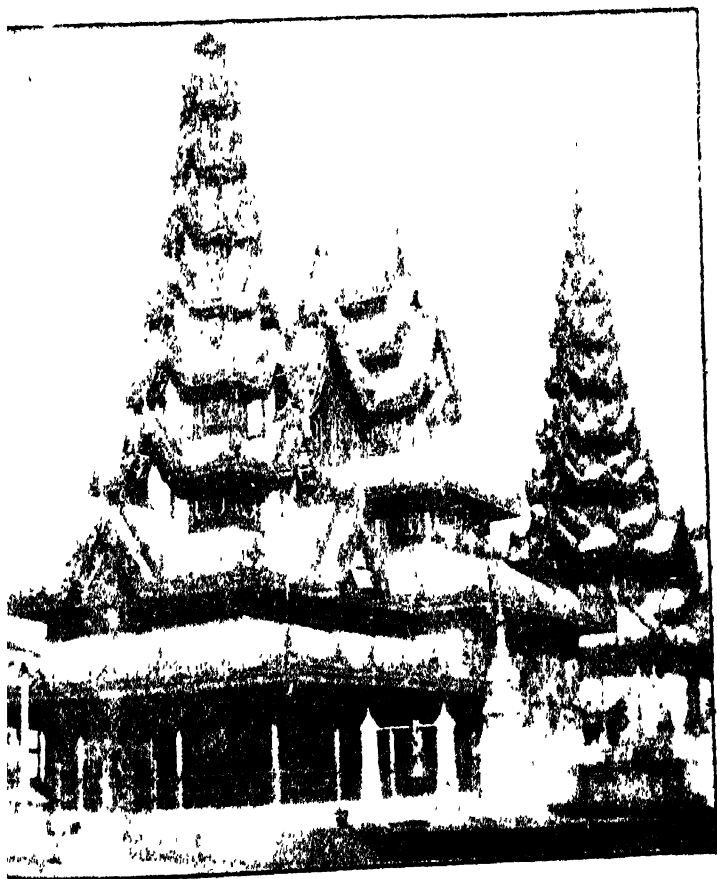
কেহ গেলেন তিব্বত। তাই কবি গাহিয়াছেন "আজিও যুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণতঃ চরণে যার।"

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বলিতেন, সে সব সে সময়ে লিখিত ছিলনা, পরে উহা লিখিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' লিখিত হইয়াছিল, সে কথা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। অশোকের ছেলে মহীন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা যখন সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তখন,—সে প্রায় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সাড়ে চারিশত বৎসর পরে ত্রিপিটকের শ্লোকগুলি লিখিত হইয়াছিল। সিংহলে উহার একখানি গ্রন্থ ছিল। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ ঘোষ বা বুদ্ধেশ্বর নামে একজন খুব বড় পণ্ডিত ব্রহ্মদেশে জন্মিয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কীর্ত্তি-গৌরব-মণ্ডিত সিংহলে গমন করেন। সেখান হইতে তিনি এক খানি 'ত্রিপিটক' ব্রহ্মদেশে আনিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের চির আদরের গ্রন্থ ত্রিপিটক ব্রহ্মদেশে আনয়নের পর হইতেই ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশের সকল লোকে সে কথা মানেন না। তাঁহারা বলেন বুদ্ধঘোষের

অনেক আগে অশোক চীন, জাপানে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, ব্রহ্মদেশেও তেমনি একদল প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, কাজেই ব্রহ্মদেশে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন অতি প্রাচীন কালে সেই অশোক রাজার সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এত সব ইতিহাসের খুঁটিনাটি তর্কের তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই, তোমরা শুধু একটী কথা জানিয়া রাখ যে ব্রহ্মদেশের লোকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধ।

ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির অবস্থিত। সে সব মঠে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক পুরুষকেই যৌবনের পূর্ব্বে কিছু দিনের জন্য পীতবর্ণের বস্ত্রাদি পরিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সাজিবার অভিনয় করিতে হয়। এইরূপ না করিলে মৃত্যুর পর তাহার পশু জন্ম হয়, বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে। কাজেই যাহারা বরাবর সংসার-ধর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাসীর অভিনয় করিয়া পরকালের পথটা খোলাসা করিতে চাহেন, তাহাদের

এইরূপ অভিনয় না করিলে চলে না। আবার অনেকে কিন্তু একেবারেই সন্ন্যাসী হইয়া যায়।

ব্রহ্মোদশের পথে ঘাটে সর্ব্বত্র পীত বস্ত্র পরা, মাথা মুড়ান, ভিক্ষার পাত্র হস্তে বৌদ্ধ—ভিক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বলের মধ্যে থাকে তিন টুক্‌রা পীতবস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র, চামড়ার কটিবন্ধ, আর ক্ষৌরকার্য্য করিবার জন্য একটি ক্ষুর, সেলাইয়ের জন্য সূচ জলছাঁকা চালুনি। তোমরা এ কথাটা বেশ জান যে বুদ্ধদেবের দশটি প্রধান আজ্ঞার মধ্যে জীব হত্যা না করাই হইতেছে সর্ব্ব প্রধান। পৃথিবীর সর্ব্বত্র জীববাস করিতেছে, জলের মধ্যেও অসংখ্য জীব প্রতিনিয়তই বাস করিতেছে। পাছে জলপান করিতে যাইয়া জলের ভিতরকার অসংখ্য প্রাণীর প্রাণনাশ করিতে হয়, এই ভয়ে বৌদ্ধভিক্ষুরা জল ছাঁকিয়া পান করেন।

প্রতিদিন প্রভাতে বৌদ্ধভিক্ষুরা দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হয়। ভিক্ষুরা কাহারও নিকট কোন ভিক্ষা চাহে না। লোকের যাহার যেমন সাধ্য তাহা ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া দেয়। ভিক্ষাপাত্রে কেহ কিছু দান

করিলে—'সুগত তোমার কল্যাণ করুন', এই কথাটি বলিয়াই নিরস্ত হন। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা অনেকেই মঠে থাকিয়া শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। সকলে ভিক্ষার জন্য বড় একটা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান না। দেশের লোকে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন, তাহার কারণ মঠের সন্ন্যাসীরা দেশের ছেলেমেয়ে ও যুবকদিগকে ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে এদেশে 'ফুঙ্গি' কহে। ফুঙ্গি শব্দের অর্থ, "অসাধারণ প্রকাশ।" যদি কোন ও ফুঙ্গির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার পেট চিরিয়া পেটের ভিতর হইতে নাড়ী ভুঁড়ি সব বাহির করিয়া তাহাতে মশলা মাখাইয়া লয়, পরে মৃতদেহটাকে স্তরে স্তরে কাপড় জড়াইয়া উহার উপর ঘন রং বা বার্ণিশ মাখিয়া ঢোলকের মত মৃতদেহের আকারে একটা কাঠের শবাধার প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর মৃতদেহ পুরিয়া খোলা দিক্‌টার মুখ ধূপ বা রজন গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার পর খোলটির উপর নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া মঠের কক্ষের মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দেয়। সেই কক্ষটির

উপর অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত একটী চাঁদোয়া খাটান থাকে। এই ভাবে মৃতদেহ রাখিয়া দিবার পর উহা শ্মশানে লইয়া দাহ করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। দাহ করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে, চারিদিকে আনন্দের উৎসব আরম্ভ হয়!

যেদিন শব দাহ হইবে, সেদিন ভোরে শব যে বাক্স বা কফিনের ভিতর আছে, সেই কফিনটি একখানা গাড়ীর উপর তুলিয়া দিয়া শ্মশানের দিকে লইয়া যায়। শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হইলে গাড়ীর বলদ খুলিয়া ফেলিয়া দুইদল লোক গাড়ী টানিতে আরম্ভ করে, এক-দল শ্মশানের দিকে, অপর দল মঠের দিকে। এইরূপ কিছুক্ষণ টানাটানির পর, মঠের দলের লোকেরা ঢিল দেয়, আর শ্মশানের দিকের লোকেরা একেবারে হড়্ হড়্ করিয়া টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া যায়। শ্মশানে শবাধার এইভাবে নীত হইলে চারিদিক্ হইতে জয়ধ্বনি উঠে। তৎপর রাশি রাশি চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দাহ্য কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া শব চিতার উপর স্থাপিত হয়, দেখিতে দেখিতে শব ভস্মীভূত হইয়া কয়েক মুষ্টি ছাইয়ে পরিণত হয়।

ফুঙ্গি বা সন্ন্যাসী যদি সাধারণের প্রীতি-ভাজন, সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হন, তাহা হইলে এই বন্ধন-বিহীন সন্ন্যাসীর নির্ব্বাণ প্রাপ্তি উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র না হইলেও নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও নগরে মেলা বসিয়া যায়। নৃত্য গীত, বাজনা, মুর্ত্তি-চিত্র এ সকলের সমাবেশ হইয়া মৃত্যুর হাহাকার ডুবাইয়া দিয়া আনন্দের প্রীতি নির্ঝর ধারা বহাইয়া দেয়। বর্ম্মনরা মৃত্যুকে তেমন একটা ভয়াবহ বলিয়া মনে করিলে কখনই এমন আমোদ আহ্লাদ করিতে পারিত না।

বৌদ্ধমঠগুলি ব্রহ্মদেশের প্রধান দর্শনীয় পদার্থ। সন্ন্যাসীরা যে সব মঠে বাস করেন, তাহার নাম কাউঙ্গ বা ফুঙ্গিচ্যাঙ। ফুঙ্গিচ্যাঙগুলি সেগুণ কাঠ দ্বারা নির্ম্মিত। পূর্ব্বে এদেশে ভূমিকম্পের ভয়ে ইট পাথরের বাড়ীঘর প্রস্তুত হইত না। মন্দিরগুলি অধিকাংশই একতল। একজনের মাথার উপর অন্য একজনের বাস করা বর্ম্মনরা একেবারেই ভাল মনে করেন না, সেজন্য দ্বিতল বাড়ীতে বাস করিতে তাহারা বড় ভালবাসে না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তন হইতেছে, এখন এ দেশের লোকেরা দ্বিতল বাড়ীতে বাস করিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করে না।

মৌলমিন প্যাগোদার ঘণ্টা।

এক একটী মন্দিরের ভিত্তি মাটি হইতে সাত আট হাত উচ্চ। এই সকল মন্দিরের নীচে যে যায়গা থাকে, সেখানে পশু-পক্ষী বাস করে, কিংবা দিনের বেলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়ায়। ছবিতে যে মন্দির দেখিতেছ, কেমন সুন্দর থাকে থাকে উপরের দিকে উঠিয়াছে, তোমরা বুঝি মনে করিতেছ যে উহা এক একটী তল, তাহা নহে, থাকে থাকে ছাতই উপরে উঠিয়াছে। এই ছাত কেমন সুন্দর! কলিকাতা ইডেন বাগানে যে কাঠের মন্দিরটী আছে, তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐ মন্দিরটী দেখিয়াছ, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে কি ভাবে ব্রহ্মদেশের মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়।

ব্রহ্মের রাজারা এইরূপ সুন্দর থাকে থাকে নির্ম্মিত ছাতওয়ালা বাড়ী, ধর্ম্ম-মন্দির, রাজপ্রাসাদ এবং উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের ব্যতীত অপর কাহাকেও নির্ম্মাণ করিতে দিতেন না। প্রত্যেক থাকের প্রতি কোণে এক একটী চূড়া, তাহার উপর কাষ্ঠের পতাকা, তাহার উপর আবার গিল্টি করা কাঠের ছাতি। পিতলের ঘণ্টা ইত্যাদি। মঠগুলি দেখিলে সত্যসত্যই চক্ষু জুড়াইয়া

যায়। চারিদিক বেড়িয়া সুন্দর পুষ্পোত্থান। মরে প্রতিভূমিখণ্ড প্রতিগাছ পালাও বর্ম্মনরা অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। মঠ, মন্দির, প্যাগোডা এই তিন শ্রেণীতে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি বিভক্ত। দেশের রাজা রাজরারা কত অতুল ধন, রত্ন ব্যয় কয়িয়া যে এ সকল মঠ, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মের জন্য এসিয়াবাসী যেমন ধন, ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিতে বিন্দু মাত্রও দ্বিধা বোধ করে না, পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশের শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ফুঙ্গিদিগের বাসস্থান 'ফুঙ্গিচ্যাঙ' গুলিই ছিল দেশের সর্ব্ব প্রধান বিত্থাকেন্দ্র। সে যুগোকোন গৃহস্থের ছেলেটি যেমন আট বৎসরের হইল, অমনি গৃহস্থ তাহাকে কাইউংএর ফুঙ্গির নিকট প্রথম হাতে খড়ির জন্য পাঠাইয়া দিতেন। ব্রহ্ম-দেশে বরাবরই বালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার রীতিটা চলিয়া আসিতেছে, বালিকাদের লেখা পড়া শিখাইবার গুরুত্ব পূর্ব্বেও যেমন ছিলনা, এখনও তেমন

নাই, তবে ধীরে ধীরে অনেকটা যে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

মঠে শিক্ষাদানের নিয়মটা ছিল কতকটা বাঙ্গালা-দেশের সেকালের গুরুমহাশয়ের পাঠশালার মত। ছোট ছোট ছেলেরা কেহ বা শ্লেট, কেহ বা ঐরূপ এক একখানা কাঠের টুক্‌রা লইয়া উপস্থিত হইলে, একজন ফুঙ্গি তাহার গায়ে বর্ণমালা লিখিয়া দিতেন, ছেলেদের উপর সেই বর্ণমালাগুলি মুখস্থ করিবার হুকুমজারি করিয়া তিনি অন্য কোন কাজ. কর্ম্মে চলিয়া যাই-তেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বালকেরা সুর করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিত, ততক্ষণ তিনি ছেলেদের দিকে বড় একটা চাহিতেন না, ভাবিতেন যে ছেলেরা বেশ মন দিয়া পড়া শিখিতেছে, কিন্তু যদি তাহাদের স্বর না শুনিতেন, তাহা হইলে মনে করিতেন যে উহারা পড়া শুনা ছাড়িয়া গোল করিতেছে। আর যায় কোথায়, অমনি ছুটিয়া আসিয়া চরচাপড়টা মারিয়া সাজা দিতেন। সে দেশের যুক্তাক্ষরের নাম শুনিলে তোমরা নিশ্চয়ই না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না, বলত তাহার নাম কি? যুক্তাক্ষরের নাম 'বিছার ধামা'। যে ছেলে পড়া শুনায়

মনোযোগী তাহার পক্ষে বর্ণমালা শিখিতে বেশী দিন লাগে না, কিন্তু যে ছেলে অমনোযোগী তাহার পক্ষে একবৎসরেও বর্ণমালা শিক্ষা হইতে পারে না।

বাঙ্গালাদেশের গুরুমশাই যেমন একজন সর্দ্দার পড়ুয়ার উপর নামতা পড়াইবার ভার দিয়া বেশ একটু আরামে নিদ্রা যাইতেন, এখানেও সে রীতিটির প্রচলন ছিল। তবে যে সকল ফুঙ্গি প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারা দেশের গৌরব ও আশা ভরসার স্থল বালকদিগের লেখা পড়া শিখাইতে যাইয়া ঐরূপ প্রবঞ্চনার ধার ধারিতেন না। বর্ণমালা শিক্ষার পর—যখন কোন ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক পড়ান হইত, তখন ফুঙ্গি মহাশয় নিজে বই দেখিয়া পড়িয়া যাইতেন, আর ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতে করিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে এদেশের লোকের বিশেষ মনোযোগ ছিল। ফুলের মত কোমল তরুণ হৃদয়ে যাহাতে অতি শৈশবকাল হইতেই ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ হয়, সেজন্য প্রত্যেক মঠেই বৌদ্ধধর্ম্মের মন্ত্র ইত্যাদি শিখাইবার একটী অতি সুন্দর নিয়ম ছিল। পীতবসন পরি-

হিত মুণ্ডিত মস্তক সৌম্যমূর্ত্তি পুরোহিত একখানি উচ্চ কাষ্ঠাসনে বসিতেন, আর ছেলেরা একসঙ্গে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশজনও মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রণাম করিতে করিতে শিক্ষক মহাশয় যে সকল মন্ত্র আওড়াইতেন তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। বুদ্ধদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা এমনি ভাবে শৈশব হইতেই তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার দরুণ, তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত দৃঢ়তা রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ছেলেরা প্রথম অবস্থায় সহজে বর্ণমালা শিখিবার জন্য সাতবারের সঙ্গে—অক্ষরগুলি মিলাইয়া একটা কবিতা মুখস্থ করে, যেমন 'তানিনলা, আইঙ্গা, শন্স।' ব্রহ্মদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লিখিতে পড়িতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষ হইতে অনেক বেশী ছিল।

এদিকে ছেলেরা মঠের বিদ্যা-মন্দিরে যাতায়াত করিতে করিতে তাহাদের বয়স যেমন পঞ্চদশ বৎসর হইল, অমনি তাহাদিগের পিতা মাতা মঠে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। মঠে পাঠাইবার পূর্ব্বে একটা উৎসব

করিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন হাতে খড়ি, অন্নারম্ভ, বিবাহ এ সকলের জন্য জ্যোতিষ ঠাকুর আসিয়া দিন, সময় ঠিক্ করিয়া যান, ব্রহ্মদেশেও ছেলেকে মঠে পাঠাইবার জন্য গণক ডাকিয়া একটা দিন, মুহূর্ত্ত ও লগ্ন ঠিক্ করা হয়। শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির হইলে, নিমন্ত্রণের ঘটা পড়িয়া যায়, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এই নিমন্ত্রণ পাইয়া কেহ খাবার জিনিষ, কেহ অলঙ্কার, কেহ বা টাকা পয়সা লইয়া উপস্থিত হন। খাওয়া দাওয়ার সোর হাঙ্গামা, বাদ্য বাজনা কোন দিক্ দিয়া অনুষ্ঠান-টিকে সফল করিবার অভাব হয় না।

মঠে যে বালক প্রেরিত হইবে, তাহাকে স্নান করাইয়া, নূতন বসন—ভূষণে সজ্জিত করিয়া বালকটিকে ঘোড়া কিংবা গাড়ীর উপর চড়াইয়া একটী বেশ সুন্দর ছাতা একজন তাহার মাথার উপর ধরে, তারপর তাহাকে সারাখানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আনা হয়। আত্মীয় স্বজন ও গ্রাম্য-যুবতীরা এই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে থাকে। একদল লোক সকলের আগে বাজনা বাজাইয়া যায়। এইরূপ শোভাযাত্রার অর্থ এই যে এই

বালকটি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেছে, একবার তাহার আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত দেখা করিয়া বিদায় গ্রহণ উচিত, সেজন্যই এইরূপ শোভাযাত্রা করা হয়।

মঠে প্রবেশের এই নিয়ম বা অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইয়া থাকে। এ ব্যাপার কতকটা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণবালকগণের উপবীত গ্রহণের ন্যায়। গ্রাম পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, বালকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। মস্তক মুণ্ডনের পর—বালক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, এই মর্ম্মে পালিভাষায় লিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া, সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য্য পীতবস্ত্র, কটিবন্ধন এবং ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের সময় বালক যে মঠে এই সন্ন্যাসের সময়টা অতিবাহিত করিবে, সেই মঠের প্রধান সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকেন। তিনি অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইলেই বালককে লইয়া মঠে গমন করেন।

এইরূপ গৃহস্থ সন্ন্যাসীদের মঠে থাকিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। কোন কোন বালক সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া আসে, কেহ একপক্ষ, কেহ এক মাস, কেহ বা তিন মাস কাল মঠেই বাস করে। মঠে বাস করিবার

সময় তাহারা 'ফুঙ্গির' নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা, সেবা এ সকল শিখিয়া থাকেন। তারপর প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে ভিক্ষা পাত্র গলায় ঝুলাইয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা করিতে হয়, এইরূপ ভিক্ষালব্ধ জিনিষই তাহাদের এক-মাত্র খাদ্য, কিন্তু যদি কোন ধনী-সন্তান মঠে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষা না করিলেও হয়, তাঁহার পিতামাতা তাহার জন্য প্রত্যহ বাড়ী হইতে প্রস্তুতি অন্ন-ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দেন, কিংবা মঠেই ছেলেকে রান্না বান্না করিয়া খাওয়ার জন্য পাচক পাঠাইয়া থাকেন।

মঠের নিয়ম অত্যন্ত কঠিন, এইরূপ নবীন সন্ন্যাসীরা কেহই রাত্রিকালে মঠের বাহির হইতে পারেন না। যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার হাত পা বাঁধিয়া যষ্টির দ্বারা প্রহার করা হয়।

মঠে যত দীর্ঘকাল বাস করা যায়, তত বেশী পুণ্য হয়, ইহাই সাধারণ রীতি। এ জন্য কেহ কেহ প্রতি বৎসর বর্ষাকালে মঠে যাইয়া বাস করে, তবে তিন বর্ষা বাস করিলেই ভাল হয়। এক বর্ষা পিতার জন্য, এক বর্ষা মাতার জন্য আর এক বর্ষা নিজের পারলৌকিক কল্যা-ণের জন্য।

ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক বাড়ীতে, প্রত্যেক গৃহস্থ ঘণ্টা বাজাইয়া বুদ্ধদেবের পূজা করেন। আমাদের দেশের যেমন কাঁশর, ঘণ্টা বাজাইলেই বুঝা যায় যে কোথাও আরতি বা পূজা হইতেছে, তেমনি যখন গ্রামের কোন বাড়ীতে ঘণ্টার মধুর ধ্বনি শোনা যায় তখনই বুঝিতে পারা যায় যে ঐ বাড়ীর গৃহস্থ এখন বুদ্ধদেবের পূজা করিলেন। বুদ্ধদেবের পূজা শেষ হইলে ঘণ্টা বাজাইতে হয়। যেমন স্তবটি শেষ হইল, অমনি ঘণ্টা ধ্বনিও আরম্ভ হইল। এই সব ঘণ্টা গুলির সহিত বাঙ্গলাদেশের ঘণ্টার গড়নের অনেক তফাৎ আছে। ঘণ্টা বাজাইবার জন্য হরিণের শৃঙ্গ বা লাঠি থাকে।

পূজার রীতি

'প্যাগোদা'র উৎসব এদেশের একটী প্রধান উৎসব। এক এক দেশের লোকের এক একটী বেশ বিচিত্র রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশের লোকের ন্যায় এমন নিরস ও বিষণ্ণ জাতি পৃথিবীর কোথাও পাইবে না, আবার ব্রহ্মদেশে যাইয়া দেখ, এমন প্রফুল্ল, উৎসাহী ও আনন্দ প্রিয় জাতি কোথাও দেখিবে না। মৃত্যু আসিয়া দরজায় হানা দিয়াছে, কোন হাহাকার নাই, দুঃখ—

জ্বালা অন্নাভাব পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, তবু মুখের অম্লান হাসিটুকু লোপ পায় নাই। ধর্ম্ম বল—তাহার মধ্যেও ইহারা বেশ আনন্দের একটা ভাব লহর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে।

প্যাগোদা ব্রহ্মদেশের একটী ধর্ম্ম উৎসব। এই পর্ব্ব মাত্র দুই দিনকাল স্থায়ী হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বুদ্ধদেবের নিকট আরাধনা ও প্রার্থনা ইত্যাদি করিতে হয়। কিন্তু আরাধনা উপাসনা ইত্যাদি এখন নামে মাত্র পর্য্যবেসিত হইয়াছে। এ উৎসবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আনন্দ-কৌতুকে দুইটী রাত্রি স্বপ্নের ন্যায় কাটাইয়া দেয়। শুধু ফুলের মালা, ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্না ও উন্মুক্ত গগন তলে সুবিস্তৃত ময়দানের মধ্যে নৃত্য গীত অভিনয় করিয়া যুবক যুবতী ও মধ্য বয়সী পুরুষ ও রমণীরা সময় অতিবাহিত করে। বৃদ্ধেরা এ উৎসবে আসেন দীর্ঘ এক বৎসর কাল পরে মিলনের একটা সুযোগ পাইয়া, তখন নানা বিষয়ের সন্ধান, কাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, কাহার কয়টি ছেলে, কে কিরূপ উপযুক্ত হইয়াছে, এই সব সংসারিক গল্প-কৌতুকে কাটাইয়া যান। প্যাগোদায় রাত্রি যাপন করিলে নির্ব্বাণ মুক্তির পথটা

অতি সহজ হয় বলিয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেই দুই রাত্রি প্যাগোদায় বেশ আনন্দ-কৌতুকের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া যান।

কি ভাবে বুদ্ধদেবকে এদেশের লোকেরা উপাসনা করে, এখানে সে কথা বলিতেছি। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপাসনা করিবার তুল্য অধিকার। পুরুষেরা মূর্ত্তির সম্মুখে উবু হইয়া বসেন এবং করযোড়ে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন। এই রূপ পূজা অর্চ্চনা করিবার সময় পায়ে কোনরূপ পাদুকা রাখা অত্যন্ত দোষণীয় গণ্য হয়।

বৌদ্ধ-উপাসনা রীতি

স্ত্রীলোকেরা হাঁটু গাড়িয়া বসেন। তাঁহারা খুব সতর্কতার সহিত পা ঢাকিয়া বসেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পা দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত গর্হিত। উপাসনার সময় হাতে সাধারণতঃ ফুল থাকে, ফুল উপাসনার পর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির উপর রাখিয়া দিবার রীতি। বৌদ্ধ উপাসনার রীতি সর্ব্বত্রই এক প্রকার, সেই একই কথা "বুদ্ধংমে শরণং গচ্ছ" অর্থাৎ—'আমি বুদ্ধের আশ্রয় লইলাম।'

'আমি বুদ্ধের বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।'

"আমি বৌদ্ধ সমাজের একজন দীন সেবক হইলাম।"

মঠে শিক্ষালাভের সময় বালকেরা নিম্নলিখিত স্তব কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে।

"হে তথাগত, দেহ, সুখ, মন দ্বারা আমি তোমার উপাসনা করি, তুমি অমূল্যধন, হে প্রভু! আমি অতি দীন উপাসক—ভক্তিভাবে, করযোড়ে, আমি তোমায় প্রণাম করি। হে সুগত! হে নির্ব্বাণ মোক্ষদাতা আমাকে অনাহার, মারীভয়, যুদ্ধ প্রভৃতি পাপ নরকের হাত হইতে উদ্ধার কর। আমার যেন নির্ব্বাণ হয়, আমি নির্ব্বাণ কামনা করিয়া তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি।"

কতকগুলি কাজ এদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা অত্যন্ত পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, যেমন কোনও ধর্ম্মমন্দিরের প্রদীপ, মোমবাতি, মশাল প্রভৃতি যদি নিবিয়া যায় তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া, কোন প্যাগোদা দেখিতে পাইলে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব স্তুতি করা। কাগজ কাটিয়া নানা প্রকার জীব-জন্তুর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া অনেক সাধক স্তবের ধ্বজা প্রস্তুত করেন। সেই কাগজে মন্ত্র লিখিয়া মন্দিরে রাখিয়া আসিলে খুব পুণ্য হয়। ঐরূপ কাগজে সাধারণতঃ লেখা থাকে,—

"এ কাগজ হেথা রাখল যেজন,

হে সুগত! করো তা:র বলবান,

আমার এই কাগজের ব:লে,

বুধবারে যে হবে ছেলে,

সে যেন পায় দেব মানবের আশীষ কল্যাণ।

শুক্রবা:র যে জন্ম নেবে

দেশের সেরা হয়ে হবে মস্ত একজন দয়াবান্

সোমবা:রে যে জন্ম নেছে,

দূর হ'ক তার আপদ বালাই ত্রিসঙ্কটে সে

. পাক ত্রাণ!

হে দয়াল! হে সুগত! ভক্ত চাহে শুধুই

নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ!

চতুর্থ অধ্যায়

নানা কথা

বাঙ্গালী ঘরের ছোট খোকা বাবু যখন কাঁদিয়া আকুল হন, কিছুতেই মা তাহাকে শান্ত করিতে পারেন না, তখন মা কতই না ছড়া পাঁচালী আওড়াইতে থাকেন, কখনও বলেন,

"ও পথে যেয়োনা বাছা হত্তোম টিমের ভয়,
তিনমিন্‌সে মাথা কাটা নাকে কথা কয়।"

তেমনি ব্রহ্মদেশের ঘরে ঘরে দুষ্টু খোকাবাবু কান্না কাটা করিলে তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্ত গান ও ছড়া পাঁচালি আওড়াইয়া মা তাঁহাকে শান্ত করিয়া থাকেন। কখনও ছেলের কান্না শুনিয়া মা গাহিতে থাকেন :—

বালকবালিকা

"কেঁদনা কেঁদনা বাছু কাঁদিও না আর,
ভাল ছেলে সে কি করে এমন চীৎকার?

আমি যে সোণার বাছা তোমার জননী,
ভাল কি বাসনা মোরে, ওরে যাদুমণি ?
যদি বাস, তবে কেন কাঁদিছ এমন ?
চুপ. কর, শান্ত হও, যাদু বাছাধন !
কোথায় তোমার বাবা, জান কি কোথায় ?
চুরুট টানিয়া যান যেথা মন ধায়।
শান্ত হও, অই বুঝি আসিছেন তিনি,
গালিমন্দ দিবে এসে, থাম যাদুমণি।
চুপ্ চুপ্ খোকামণি হতভাগা ছেলে,
ম্যাও ম্যাও রব করি কে আসিছে চলে
যদি না থামিবে বাছা, বিড়াল ডাকিয়া,
এখনি তাহার কাছে দিব যে ছাড়িয়া।
আঁচড়ে কামড়ে দেবে দুরন্ত বিড়াল,
তখন থামিবে বুঝি ও মোর দুলাল !"

আবার যখন খোকাবাবু বেশ শান্ত শিষ্টভাবে খেলা ধূলা করিতে থাকেন, তখন মা মনের আনন্দে দোলা দিয়া গাহিতে থাকেন,—

"অই যে আসিছে বাছা—জনক তোমার।
চুপ্ চুপ্ শোনে এই গানটি অ মার।
দে দোল্—দে দোল্ বলি দোলায়ে তোমায়,
কত খেলা দেখিবেন—সেকি বলা যায় !"

তারপর শিশু বড় হইলে কেমন করিয়া লেখা পড়া শিখে, সে সব কথা, তোমাদের কাছে আগেই বলিয়াছি।

ব্রহ্মদেশে নানাজাতির লোকের বাস। ব্রহ্মের লোকদিগকে ভারতের লোকেরা এক কথায় 'মগ' বলিয়া থাকেন। এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ খর্ব্বাকার, মোটা মোটা এবং বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। মাথায় খুব লম্বা কালো চুল হয়, ইহাদের দাড়ি গোঁপ তেমন হয় না। ইহারা সূত্রধরের ও কর্ম্মকারের কাজে অত্যন্ত সুনিপুণ। ব্রহ্মদেশের কাঠের কারুকার্য্য জগদ্বিখ্যাত। যদি একজন মগকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি জাতি, অমনি সে উত্তর দিবে, আমি 'ব্রাণমা' বা বা মা।

ব্রহ্মদেশের অধিবাসী

ব্রহ্মদেশে—অতি প্রাচীনকালে, কোন্ জাতি বাস করিত, সে কথা বলা বড় সহজ নয়। কোন কোন বড় বুড় পণ্ডিতের মতে 'মূণ্' নামে এক জাতিই এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী। এ ইতিহাস কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের দুইশত বৎসরের পূর্ব্বের মাত্র। এই

মূণ্‌দের পূর্ব্ব পুরুষেরা আবার ছিলেন ভারতের লোক। তাহা কেমন করিয়া হইল, বলিতেছি।

অতি প্রাচীনকালে প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ে উড়িষ্যার দক্ষিণদিকের তৈলঙ্গ দেশের লোকেরা জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য-উপলক্ষে ঐরাবতী, সিত্বাং, সালুইন প্রভৃতি নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে আসা যাওয়া করিতেন, তাহারা এদেশে যাতায়াত করিতে করিতে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি করিতে থাকে, উহারই ফলে মূন্‌বংশের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ কেহ বা আপনাদের দেশের ও জাতির স্মৃতিটুকু বজায় রাখিবার জন্য তালায়িন্, তৈলঙ্গী ইত্যাদি নামে কিছুদিন আপনাদের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন, পরে ঐ সব নাম লোপ পাইয়া এক মূন্ নামেই সকলের পরিচয় চলিতেছে। তালায়িন্ ও মগদের চেহারায় অনেক তফাৎ আছে, তালায়িনেরা মগদের অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। ইহাদের নাকও থাদা নহে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে স্ত্রীলোকেরা যেমন পর্দ্দানশীন, ব্রহ্মদেশে তাহা নহে, ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে চলাফেরা ও কাজ কর্ম্ম

করে। একদিকে যেমন ঘর গৃহস্থালীর কাজ করে, তেমন আবার বাজারে যাইয়া জিনিষ পত্র কিনিয়া আনে। পুরুষদের দু'বেলা দু'টি খাওয়া এবং আরাম করিয়া বেড়ান ছাড়া, আর কোন ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয় না। তাহারা যেমন দিন রাত্রি পরিশ্রম করে, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যও বেশ বোঝে, কেমন করিয়া দু'টি পয়সা আসে, সে চিন্তা তাহাদের সর্ব্বদাই থাকে। প্রত্যেক বর্ম্মন স্ত্রীলোকই বিক্রয়ের জন্য নিজ গৃহে শুটকি মাছ, সুপারি, নারিকেল, চুরি এ সকল বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা দেখিতেও বেশ সুন্দরী। পুরুষের ন্যায় তাহারাও ধূমপান করে।

স্ত্রীলোকের কেশ এত দীর্ঘ হয় যে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত গিয়া পড়ে। স্ত্রীলোকেরা বেণী পিঠের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেয়, ফুলের মালা জড়াইয়া রাখে, যাহাদের দীর্ঘ কেশ নাই, তাহারা পরচুলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। চুলের জন্য ইহাদের যত্ন খুব বেশী।

স্ত্রীলোকেরা সন্তান-পালন, গৃহকার্য্য, বাহিরের কাজ, আর ব্যয় এই সব লইয়া দিন রাত্রি খাটিয়া অতি অল্পই অবসরের সময় পায়, পুরুষদের সময় কাটাইবার মত কাজ-

ও জোটে না। তাহারা কি করে শোন। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে মগ বাবু বেশ দিব্য আরামের সহিত স্নানটি সারিয়া রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হন, এখানে সেখানে পাড়ার দশজনের সহিত গল্প গুজব করিয়া যখন ক্ষুধা বোধ হয় তখন বাড়ী যাইয়া দিব্য আরামের সহিত খাওয়া সারিয়া বেশ একটু নিদ্রা যান, তারপর সেই গল্প, সেই হাসি, সেই চুরুট, সেই ধূমপান। সাধারণ ভাবে বর্ম্মনরা খাটিতে চাহে না বটে, কিন্তু একবার যদি তাহা-দিগকে নৌকার বাইচ্, অভিনয়, বা কোন একটা উৎ-সবের কথা বলিতে পার, তাহা হইলে আর কথা নাই, দেখিবে তাহাদের কত বড় উৎসাহ। শুধু ধান বোনা ও ধান কাটার সময়ই বর্ম্মনরা যা কিছু একটু পরিশ্রম করে। মোরগের লড়াই, মহিষের যুদ্ধ ইহাদের একটা পরম আনন্দের খেলা। যদি কোন গ্রামের মোরগ বা মহিষ, অন্য কোন গ্রামের মহিষ বা মোরগের সহিত লড়াইয়ে জয় লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর যায় কোথায়? একেবারে আনন্দের তুফান বহিয়া যায়।

আনন্দ ছাড়া বর্ম্মনরা আর কিছুই জানিতে চাহে না;

কোনরূপেই তাহারা মনের মধ্যে দুঃখ বেদনা পোষণ করিতে চাহে না। এখানে তোমরা সে বিষয়ের একটী গল্প শোন। তোমরা বোধ হয় রূপকথায় পড়িয়াছ যে, একদেশের রাজা ঘোষণা করিলেন যে, রাজ্যের মধ্যে যারা সকলের চেয়ে বেশী কুঁড়ে, তিনি তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবেন। অনেক লোকই কুঁড়ে বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া খোরাক পোষাকের জন্য উপস্থিত হইল। রাজা দেখিলেন, রাজ্যের অর্দ্ধেক লোকের আহার জোগাইবার অবস্থা দাঁড়াইল। তখন তিনি প্রমাদ গণিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, ইহার উপায় কি? মন্ত্রী বলিলেন কুঁড়েদের বাস গৃহে আগুণ ধরাইয়া দিলেই পরীক্ষাটা সহজ হইবে। রাজা বলিলেন তাহাই কর। মন্ত্রী কুঁড়েদের বাস গৃহে আগুণ ধরাইয়া দিবা মাত্র ঘর হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া আসিল। ঘরে মাত্র দুইজন লোক শুইয়াছিল। একজন লোকের পিঠে যখন আগুণের হল্কা আসিয়া লাগিল, তখন সে অতি মৃদু কণ্ঠে সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, পি শো, কি না পিঠ পোড়ে, সঙ্গী কহিল ফি-শো, ফিরিয়া শোও। মন্ত্রী ইহাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে রাজ-

পাতাডার ঘর

মন্দাজর স্তুপ
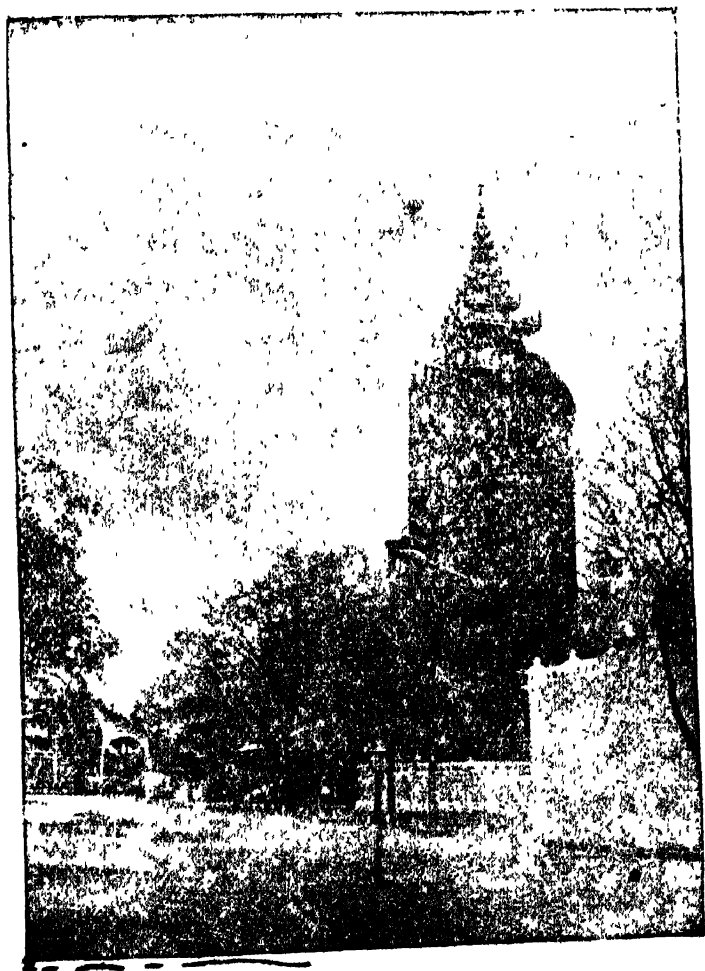
বাড়ীতে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া সমুদয় কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! মাত্র এই দুই জন কুঁড়ের ভরণ-পোষণ করিলেই চলিবে, ইহারাই প্রকৃত কুঁড়ে।"

বর্ম্মণেরা কিন্তু কুঁড়েমিতে ইহাদেরও হারাইয়া দেয়। একবার ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয়ে ভয়ানক আগুন লাগিল, অগ্নিতে নগরের বাড়ীঘর ভস্ম হইয়া গেল। অতি কষ্টে নগরবাসীরা কোনরূপ এক বস্ত্রে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তখন কয়েকজন দয়ালু বিদেশী ভদ্রলোক গরীব দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্যের জন্য নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা এক দরিদ্র-পল্লীতে আসিয়া দেখিলেন, যাহাদের তৃণমাত্রও আগুনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই, তেমন কয়েকজন লোক মিলিয়া একটা চালা তুলিয়া খুব হাসি তামাসার সহিতে আগুণে পুড়িয়া যাওয়ায় যে অবস্থা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অভিনয় করিতেছে। তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এ কয়েকটি জাতি ছাড়া নিম্ন ব্রহ্মে আর একটী জাতি বাস করে, তাহাদের নাম কারেণ। এদেশে ইহাদের

সংখ্যাই সকলের চেয়ে বেশী। ইহারা তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা, পু, সাগাউ, ঘাট। এই তিনটি শাখা হইতে আবার নানা শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, আমাদের বাঙ্গলাদেশের ছত্রিশ জাতির মত আর কি!

ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বদিকে শান্ নামে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য আছে। নিম্নব্রহ্মদেশের অধিবাসীরাই এই শাঁন রাজ্যের লোক। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে আসামের আহোম জাতি এই শানদেরই বংশধর। শানেরা কৃষিকার্য্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেঁচা-কেনা এসব কাজে খুবই পটু।

ব্রহ্মদেশে চীনদেশের লোকও বড় কম নহে। তা ছাড়া চীন্, কাখিয়েন্, সিংফো প্রভৃতি আরও কয়েকটি জাতি আছে। ইহাদের আদিবাস ছিল বনে জঙ্গলে ও পর্ব্বতের নিভৃত অঞ্চলে। পূর্ব্বে ইহাদের ব্যবসা ছিল ডাকাতি ও লুট পাট্—হঠাৎ পাহাড় হইতে দলে দলে নাবিয়া আসিয়া লুঠতরাজ করিয়া পলাইয়া যাইত। এখন কিন্তু সেদিন আর নাই, এখন অসভ্য জাতিরাও মগদের অনুকরণ করিয়া, মগের দলে মিশিয়া গিয়াছে। এক কথায় উচ্চ ব্রহ্মদেশই হইতেছে বর্ম্মনদের খাঁটি

বাসস্থান। আর নিম্ন ব্রহ্মদেশে হইতেছে তৈলঙ্গী এবং মুনদের দেশ।

চীনারা এদেশে এখন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের শতকরা আশীজনই এদেশের স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া দিব্যি আরামে বসবাস করিতেছে।

এক কথায় মগেরা বেশ ধীর, স্থির এবং শান্ত স্বভাবের লোক, কোন গোলমাল হৈ চৈর ভিতর ইহারা থাকিতে চাহে না। বড় ধনী ও বড়লোক হইয়া ফূর্ত্তি করিয়া দিন কাটাইব, এমন ভাবনা তাহাদের নাই। যদি হাতে টাকা হইল, তাহা হইলে—প্যাগোদায় গিয়া কোন একটা ধর্ম্মোৎসব করিয়া আসিতেই তাহারা আনন্দ পাইয়া থাকে। কাজ কর্ম্ম করিয়া খাটিয়া উপার্জ্জন করিতে বর্ম্মনরা বড় একটা ভালবাসে না। এদেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী। মগেরা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া চুরুট টানিয়া দিন কাটাইতে ভালবাসে। মগেদের বিশ্বাস যে পুরুষের সুখ, শান্তির জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি, পুরুষদিগকে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে খাওয়াইবার

জন্যই বিধাতা স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশেরও এমনই নিয়ম দাঁড়াইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরাও এই রূপ বিশ্বাস করিয়া দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া পুরুষদের অন্নের সংস্থান করে।

আহার

বর্ম্মনদের খাওয়া দাওয়ার রীতি নীতির কথাটা এখন শোন। আমরা যেমন দুইবার আহার করি, বর্ম্মনরাও তেমনি দুইবার আহার করে। একবার ভোর আটটায় আর বিকেল পাঁচটায়। বর্ম্মনদের প্রধান খাদ্য ভাত। ইহারা সাহেব-দের মত কাঁটা চামচ বা চীনা বা জাপানীদের ন্যায় শলাকা ব্যবহার করে না। বারকোষের মত খুব বড় একটা পাত্রে ভাত রাখে, আর বাটীতে করিয়া ডাল, তরকারী প্রভৃতি ব্যঞ্জনাদি সজ্জিত থাকে। আমাদেরি মত প্রয়োজন হইলে বাটী হইতে ডাল, তরকারি ঢালিয়া নেয়। ইহারা লঙ্কা ও পেঁয়াজের বড় ভক্ত। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যের লোকদের খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে ইহাদের বেশ মিল দেখা যায়। তরি তরকারিতে আরও যে কত প্রকারের মসলা ব্যবহার করে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। একটা সংস্কৃত কবিতা আছে যে—

"তিন্তিড়ী ঘ্রাণ মাত্রেন অন্নং চলতি পঙ্কবৎ

এদেশে একথাটি বেশ খাটে। তেঁতুল ইহাদের বড় প্রিয় সামগ্রী। আমাদের দেশেই তেঁতুলের টকের আদর কি কম ? গরিব-দুঃখীরা, যাহাদের তেমন অর্থ সঙ্গতি নাই, তাহারা তেঁতুলের সঙ্গে আমপাতা দিয়া ঝোল রাঁধিয়া দিব্যি আরামের সহিত খায়।

এদেশের লোকে চাট্‌নি-নপ্পি খুবই ভালবাসে। সে সব চাট্‌নির দুর্গন্ধে তোমরা হয়ত মুখে ও নাকে কাপড় গুঁজিয়া দশক্রোশ রাস্তা ছুটিয়া পলাইবে। সাধারণতঃ পচামাছের চাট্‌নিই ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। কি ভাবে চাট্‌নি প্রস্তুত হয়, এবার সে কথাটা শুনিয়া লও। খুব পচামাছের সহিত লাল পিপ্‌ড়া চটকাইয়া লইয়া উহা তেলে ভাজিয়া লইলে, তবে অতি উৎকৃষ্ট চাট্‌নি প্রস্তুত হইল। ইহারা মাংসও খুব ভাল বাসে। গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, হাঁস, কুকুর, সাপ, হাতী, ঘোড়া [সকল প্রাণীর মাংসই ইহারা খাইয়া থাকে। চা জিনিষটা মগেরা ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই পরম আদরের সহিত খাইয়া থাকে। ভাত খাইবার সময় সাধারণতঃ ইহারা জল

পান করে না। ভাত খাওয়ার পর, ইহারা শীতল জল পান করে এবং শীতল জল দিয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলে।

এদেশের লোকে দিন দিন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিলাতি মদ খাইতেও শিখিয়াছে। এই পাপ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অনেককেই ধ্বংসের পথে টানিয়া লইতেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করার নিয়মটা সব দেশেই প্রচলিত। বর্ম্মনরাও আহারাদির পর স্বামী, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সব একসঙ্গে বিশ্রাম করিতে বসে। এ সময়ে ধূমপানটা খুব চলে। ধূমপান অর্থে চুরুট খাওয়া। বর্ম্মনরা যে চুরুট খায়, তাহার নাম সবুজ চুরুট। এক একটী সবুজ চুরুট সাত আট ইঞ্চি লম্বা, ও এক ইঞ্চি বেড়ের হইয়া থাকে। চুরুটগুলির গোড়াটা মোটা এবং আগাটা সরু থাকে। সেগুণের পাতা দিয়াই সাধারণতঃ চুরুট মোড়া হয়, চুরুটের মাথায় একটু লাল রেশমী সূতা বাঁধা থাকে। চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া সেই সঙ্গে পান চিবান, তাহাদের প্রচুর বিলাস।

বর্ম্মনদের সাজপোষাকের কথা শোন। তোমরা

সাজ পোষাক

অনেকেই হয়ত পথে ঘাটে বর্ম্মনদের দেখিয়াছ। ধনীদের পোষাক দেখিতে বেশ, আমাদের বাঙ্গলাদেশের মত কাছা কোঁচা দিয়া পরে এবং ধুতির আঁচলটা কাঁধের উপর ফেলিয়া দেয়। গায়ে জেকেট ও তাহার উপর চাদর ঝুলাইয়া দেয়। মাথায় রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দিয়া থাকে। গরীবেরা সূতার কাপড় 'লুঙ্গির' মত ব্যবহার করে, তবে সকলেই রেশমী কাপড় বা রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে।

মেয়েরা বুকের উপর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া কাপড় পরে। গায়ে ঢিলা জেকেট, আর কাঁধে রেশমী রুমাল ঝুলায়। খোপায় ফুল গুঁজিতে ইহারা খুব ভালবাসে। এদেশে ফুলের বড় আদর।

বাস-গৃহ

ব্রহ্মদেশের প্যাগোদা ও বড় বড়লোকের বাড়ী ঘর দেখিলে মনে হয়, কি সুন্দর এদেশের লোকের বাড়ী ঘর। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে। সহর ছাড়িয়া একবার গ্রামের দিকে আসিলে, এদেশের অধিকাংশ লোকের বাড়ী ঘর দেখিয়াই বিস্মিত হইবে। তোমাদের কাছে আগেই বলিয়াছি—ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন রাজ-

দরবারের আইনের জন্য লোকে ইচ্ছামত ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারিত না। কাজেই দেব—মন্দির, রাজবাড়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বাড়ী ছাড়া, সুন্দর বাড়ী ঘর বড় একটা ছিল না, এখনও নাই।

বর্ম্মনরা তিন চারি হাত উচু মাচার উপর ঘর তৈরী করে। মাটি হইতে এতটা উচুতে ঘর তৈয়ারী হয় বলিয়া বর্ষাকালে ঘরের মেজে সেঁতসেঁতে হইতে পারে না। প্রত্যেক ঘরেই গৃহস্থেরা নিজ নিজ প্রয়োজন মত একটী দুইটী বা তিন চারিটি কোঠা তৈয়ারী করে। প্রত্যেক ঘরের সহিতই বারান্দা থাকে। বারান্দা—ঘরের মেজ হইতে অন্ততঃ দুই হাত নীচু থাকে। বারোন্দা হইতে ঘরে উঠিবার জন্য ছোট ছোট কাঠের বা বাঁশের সিঁড়ি থাকে।

বাঙ্গলাদেশের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও গণক ঠাকুর মহাশয় কোন্ শুভদিনে ঘরের খুঁটি প্রথম পুতিতে হয় সেদিন তারিখটা বলিয়া দেন। গরীব দুঃখীরা বাঁশ দিয়াই ঘর বাড়ী তৈয়ারী করে, আর যাহাদের টাকাকড়ি আছে, তাহারা কাঠের ঘর বাড়ী প্রস্তুত করেন। ঘরের উপরটা খড়, টালি কিংবা কাঠের তক্তি দিয়া ছাওয়া হয়।

এদেশে আগুণের ভয় বড় বেশী, প্রায়ই ঘরে আগুণ ধরিয়া যায়, এজন্য প্রত্যেক বাড়ীর ঘরের চালের সহিত এক একটা লম্বা মই লাগান থাকে। যখন গ্রামের কোন বাড়ীর আশে পাশে আগুণ লাগে তৎক্ষণাৎ অমনি মই বাহিয়া উঠিয়া ঘরের চাল হইতে সমস্ত খড় নামাইয়া ফেলা হয়। কেহ কেহ বা আরও সতর্কতার জন্য ঘরের চালের উপর জলভরা কলসী রাখিয়া দেয়! রেঙ্গুন, মৌলমিন, মান্দালয় প্রভৃতি বড় বড় সহরে আজকাল টালি ও তক্তার টুক্‌রা দিয়া ছাওয়া ঘরের সংখ্যাই বেশী।

ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ ঘরের মেজটায় তক্তার পাটাতন করা। গরীবেরা বাঁশের মাচা দিয়া মেজ তৈরী করে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রাচীন আদর্শ অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, এখন ধনবান্ বর্ম্মনদের ঘরে—ইংরাজি আস্‌বাব, সোফা, চেয়ার, টেবিল, বাক্‌স, এ সকলের আম্‌দানি হইয়াছে। রান্না-বান্না সাধারণতঃ ঘরের বাহিরে উঠানের উপর হয়, কিন্তু বর্ষার সময় কাঠের বাক্স কাটিয়া চুলা তৈয়ারি করিয়া তাহাতেই রাঁধিয়া থাকে।

কৃষকদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই ধানের গোলা

আছে। এদেশের লোকে উদ্‌খলে করিয়া ধান ভানিয়া থাকে। গো-মেষ মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকে। বর্ম্মনরা কুকুর অত্যন্ত ভালবাসে, এমন বাড়ী নাই, যে বাড়ীতে দুই একটী কুকুর না আছে।

আমোদ প্রমোদ ও রীতি নীতি

বাঙ্গলাদেশের অনেক অঞ্চলে পূর্ব্বে মেয়েদের মধ্যে উল্কি পরার বিশেষ রীতি ছিল। এখন সে সব লোপ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে আজকালও উল্কীপরার প্রথাটা লোপ পায় নাই। অনেক সভ্যদেশে যেমন ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মান প্রভৃতি দেশেও উল্কি পরার রীতিটা প্রচলিত আছে। জাহাজি গোরাদের এমন একজনও খুঁজিয়া পাইবেনা যাহাদের হাতে, পিঠে এবং অন্য কোন স্থানে উল্কি না আছে। ব্রহ্মদেশেও উল্কি পরার খুবই ধুম। ছেলে বেলায় বালক বালিকাদের দেহে বাঘ, বিড়াল, বানর, হাতী টিকটিকি, পক্ষী, কাঠ বিড়াল, বুদ্ধের মূর্ত্তি এসকল আঁকিয়া দেওয়া হয়। উল্কি পরিতে ছেলে মেয়েদের যে, কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সময় সময় প্রাণ পর্য্যন্ত যায়

যায় হয়, তাহাও ইহারা গ্রাহ্য করে না। ইহাদের মধ্যে এমনি সংস্কার আছে যে যদি কাহারও দেহে মন্ত্রপূঃত কোন উল্কি থাকে তাহা হইলে তাহার সাপে কামড়াইলে মৃত্যু হইবে না। এমন কি বন্দুক, কি কামানের গুলিও তাহার কিছুই করিতে পারিবে না।

এইবার মেয়েদের কর্ণবেধের গল্প বলিতেছি। প্রত্যেক দেশের মেয়েরাই এ কাজটি করেন, তাহার মূলে অলঙ্কার পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু বর্ম্মন মেয়েদের জীবনে ইহা একটী বিশেষ ঘটনা। যে পর্য্যন্ত তাহার কর্ণবেধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত সমাজের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার একা কোথাও যাইবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গণকঠাকুর মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কর্ণবেধের দিন ঠিক্ করিয়া দিলেন এবং সোনা কিংবা রূপার সূচ দ্বারা বলিকার কর্ণবেধ করা হইল, তখন হইতে সে একেবারে স্বাধীন হইয়া গেল। যেখানে ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পারে। মুখে পাউডার মাখিয়া, সযত্নে চুল বাঁধিয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে ঘরের বাহির হয়। এই কাণের ছেঁদা এত বড় হয় যে উহার ভিতরে ব্রহ্মরমণীরা অনায়াসে

চুরুট পুরিয়া লয়, এবং প্রয়োজন মত খুলিয়া লইয়া চুরুট টানিতে থাকে।

যে দেশে স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা সে দেশে বিবাহের বিষয়েও যে স্বাধীনতা থাকিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

বিবাহের রীতি

এদেশের স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা আছে দেখিয়া, যাহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে। পিতামাতারাও এ বিষয়ে কেহ কোনরূপ আপত্তি করেন না। এইভাবে পুরুষ ও নারী স্বাধীন ভাবে আলাপ পরিচয় হইয়া গেলে, যখন উভয়ের মনের মিল হয়, তখন পিতা মাতার অনুমতি লইয়া শুভদিনে বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের কতকগুলি বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে, যে নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ হইলে বরও কন্যা উভয়েই বিবাহিত জীবনে সুখী হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। প্রথমতঃ বরের যে বারে জন্ম, মেয়েরও যদি সে তারিখে জন্ম হয়, সেরূপ বিবাহ খুবই ভাল! যেমন শনিবারে যে পুরুষের জন্ম, সে কখনই শুক্রবারে যে মেয়ের জন্ম হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। শনিবার ও

বৃহস্পতিবার, এ দু'টিবার বর্ম্মনদের নিকট অত্যন্ত খারাপ বার, এই দুইবারে পুরুষ ও নারীর বিবাহ হইলে, একজনের অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য।

বিবাহের পর দুই তিন বৎসর কাল জামাতা শ্বশুরালয়ে বাস করেন। এ সময়ে জামাতা যে টাকা কড়ি উপার্জ্জন করে, তাহা শ্বশুরের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যই ব্যয় হয়। ইংরেজদের ন্যায় স্বামী ও স্ত্রীর বনিবনাও না হইলে আবার বিবাহ ভঙ্গ হইয়াও যায়। তবে নেহাৎ কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে বা আপত্তির কারণ না থাকিলে বিবাহ বড় কেহ একটা ভঙ্গ করে না।

নামকরণ

ছেলে মেয়েদের নামকরণও এ দেশের একটা উৎসব। কোন্ দেশেই বা না! সকলেই আপনার ছেলেটি কুৎসিৎ কুরূপ হইলেও তাহার একটি সুন্দর নাম রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। গণক শুভদিন নির্ণয় করিয়া দিলে আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর ভোজের সহিত নামকরণ কাজটি সুসম্পন্ন হয়।

শিশুর যে বারে জন্ম, সে বারের প্রথম বর্ণটি নামের সহিত সংযুক্ত করা হয়। তোমরা আমাদের দেশের

পঞ্জিকা খুলিলে দেখিতে পাইবে, কোন্ বারে কোন্ মাসে সন্তান জন্মিলে সে কিরূপ হইবে, তাহার একটা ফলাফল লেখা আছে। পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই এই কুসংস্কারটি আছে। এমন যে সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া বেড়ান, সেই ইংরেজ জাতও এইরূপ কুসংস্কারের অধীন ।

ব্রহ্মদেশের লোকরাও মনে করেন যে জন্মবার অনুসারে লোকের স্বভাবের বৈচিত্র্য হয়। সোমবারে যে ছেলেটির জন্ম হয়, সে ছেলেটি হয় হিংসুক, মঙ্গলবারে যে ছেলেটী জন্মে সে হয় খুব ভাল, শান্ত, শিষ্ট। বুধবারের ছেলে হয় রাগী, বৃহস্পতিবারের ছেলে নম্র ও বিনয়ী, শুক্রবার জন্মিলে বাচাল, তার্কিক, শনিবারে জন্মিলে অত্যন্ত ঝগড়াটে হয়, আর রবিবারে যাহার জন্ম হইবে, সে হইবে বেজায় কৃপণ। আবার এক এক বারের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন্তুর মিল আছে। সোমবারে বাঘ, মঙ্গলবারে সিংহ, বুধবার হাতী,বৃহস্পতিবারে ইন্দুর, শুক্রবারে শূকর, শনিবারে সর্প, রবিবারে পক্ষী ও পশু মিলিত এক প্রকার অদ্ভুত জন্তু। যাহার যে বারে জন্ম হয়, সে সেই বারের প্রিয় জন্তুর আকার অনুসারে মোমবাতি প্রস্তুত করিয়া আগোদার যাইয়া দেবতার উপাসনা করে।

বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক লোকের নামের পেছনে তাহার জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ এক একটা কথা থাকে, আর শ্রীযুক্ত, শ্রীমান, বাবু এইসকল শব্দ সংযুক্ত হইয়া তাহার পরিচয় প্রকাশ করে। ব্রহ্মদেশে লোকের নামের পেছনে কোন উপাধি নাই। শ্রীযুক্ত বাবু এই সকলের ন্যায় নামের আগে মোং শব্দটীর ব্যবহার হয়। এদেশের লোকেরা যখন ইচ্ছা তখনই নাম বদলাইতে পারে, তাহাতে তেমন কিছু আটকায় না।

নাম বদ্‌লাইতে হইলেও বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগকে 'মি' অর্থাৎ মা বলিয়া ডাকিলে তাহারা বেশ সন্তুষ্ট হয়।

আমোদ প্রমোদ

ব্রহ্মদেশের লোকের যে খুব আমোদ প্রিয়, সে কথা তোমাদের কাছে পুর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে এদেশের লোকে সাধারণতঃ কি কি আমোদ করিতে খুব ভাল বাসে, এখানে সে কথা বলিতেছি।

নৃত্য—বর্ম্মণ স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই নৃত্য খুব ভাল-বাসে। তাঁহাদের মধ্যে অল্প বিস্তর সকলেই নাচিতে জানে। যে কোন উৎসব উপলক্ষে নৃত্য হওয়াই চাই।

হয় বাড়ীর বা গ্রাম্য বালকবালিকারা নৃত্য করিবে, নচেৎ ব্যবসায়ী নর্ত্তকী টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া তাহাকে দিয়া নাচান হইবে। নৃত্য ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সকল সময়েই হয়।

নাটকাভিনয়—একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ পর্য্যটক লিখিয়াছেন "যে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশের লোকেরাই রঙ্গালয়ের পক্ষপাতী কিন্তু এ বিষয়ে বর্ম্মনরা বোধ হয় সকল দেশের অগ্রণী, এবিষয়ে তাহাদিগকে কেহই পশ্চাতে ফেলিতে পারেনা।" আর এদেশে তুমি বোধ হয় হাজার করা এমন একজন লোকও খুঁজিয়া পাইবে না, যে জীবনে একদিন না একদিন রঙ্গালয়ে অভিনয় না করিয়াছে। সন্তানের জন্ম, তাহার নামকরণ, বালিকার কর্ণবেধ, বালকের মঠে প্রবেশ, বিবাহ, বিবাহ-ভঙ্গ, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ছোট বড় সকল উৎসবেই অভিনয় হয়। এদেশের অভিনয় ঘরে হয় না, মধ্যে বাহিরে চাঁদোয়া খাটাইয়া খোলাউঠানে বা মাঠে অভিনয় হয়। এ অভিনয় কতকটা যাত্রার মত। এইরূপ অভিনয়ের ব্যয়ভার যখন যিনি যে বাড়ীতে করেন, তাহাকেই বহন করিতে হয়।

নৌকাবাইচ—নৌকার বাইচও এদেশে বিস্তর। এদেশে নদ নদীর সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনি লোকে নৌকার বাইচ খেলিতেও বেশ ভালবাসে। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের মধ্যে নৌকায় প্রতিযোগীতা হইয়া থাকে, যে দল জয়ী হয়, তাহারা আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখর করিয়া তোলে।

ব্রহ্মদেশের ভাষা

ব্রহ্মদেশের ভাষা অতি কঠিন। আমারা যেমন বামদিক্ হইতে লিখিতে আরম্ভ করি, ইহারাও তেমন ভাবেই লেখে। অক্ষর-গুলি গোলাকার, কতকটা উড়িয়া হরপের মত। পণ্ডিতেরা বলেন যে,—পালি ও মাগধি অক্ষরের সহিত একরূপ, পালিসি ও মাগবি হইতে ইহার জন্ম এমন কথাও অনেকে বলেন। স্বরবর্ণ দশটি এবং ব্যঞ্জন বর্ণ বত্রিশটি। বর্ম্মনদের ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে, তাহার অধিকাংশই পালি হইতে গৃহীত এই ভাষায় বুদ্ধের নাম ফ্রগ, বোধিসত্ত্বকে কহে ফ্রলং ব্রহ্মদেশের ভাষায় নাটক, কবিতা কাব্য সবই আছে।

কৃষিকার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মদেশের শতকরা নিরানব্বুইজন

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

লোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গোরু ও মহিষের সাহায্যে এদেশের কৃষিকার্য্য হয়। এদেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধেনো জমি পরিষ্কার করিয়া ভাদ্র মাসে বপন করে এবং পৌষ মাঘ মাসে ধান কাটিয়া মরাই জাত করে। এদেশের জমি নিম্ন বাঙ্গলার জমির ন্যায় অত্যন্ত উর্ব্বরা। অতি অল্প শ্রমেই প্রচুর ফসল জন্মে। তোমরা শুনিয়াছ যে পূর্ব্ব কালে সেই বৈদিক যুগে আমাদের আর্য্যঋষিরা নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষবাস করিতেন। জনক রাজাও কৃষিকার্য্য করিতেন, নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। ব্রহ্মদেশের রাজাও প্রত্যেক বৎসর এক শুভদিনে ক্ষেতে আসিয়া নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিতেন। এ দেশে অনেক চাউলের কল আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ প্রায় পৃথিবীর সব দেশেই চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে।

বস্ত্রবয়ন-এদেশের একটী প্রধান শিল্প। এমন গ্রাম নাই-এমন বাড়ী নাই যেখানে তাঁত না আছে, আর পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁত বুনিতে না পারে। গৃহস্থেরা অতি সুন্দর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে। গুটী পোকা পুষিয়া রেশমী বস্ত্র

বৃহৎ ঘণ্টা।

বিমল

প্রস্তুত করিতে পারিলে এদেশের লোকে প্রচুর লাভ' করিতে পারিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে জীব হত্যা নিষেধ বলিয়া গুটি পোকা পালিয়া ঐরূপ ব্যবসায় এদেশে প্রচলিত নাই। যাহারা গুটি পোকার চাষ করিয়া রেশম প্রস্তুত করে, তহারা সমাজের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত। ব্যাধ এবং জেলে এদু'টী জাতিকে উহারা খুব বেশী ঘৃণা করে। বর্ম্মনরা বলেন যে যাহারা এরূপ ব্যবসায় করে, পরকালে তাহাদের মুক্তি নাই। জেলেরা কিন্তু বেশ বলে, তাহারা বলে যে—"আমরাত বাবু মাছ মারিনা, শুধু তাহা-দিগকে জল থেকে ডাঙ্গায় তুলি, ইহাতে আর কি এমন অপরাধ ?"

বর্ম্মনেরা পূর্ব্বে দেশী কাপড় ছাড়া কিছুই পরিতনা, কিন্তু এখন বিলাতী কাপড়ের আম্‌দানীর সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মনরাও সস্তাদরে সে কাপড়ই পরিতেছে।

ব্রহ্মদেশের গালার কাজ ও কাঠের কাজ জগদ্বিখ্যাত। ইহারা অতি সুন্দর বৃহৎ মঠ ও মন্দির যেমন নির্ম্মাণ করিতে পারে, তেমনি ছোট ছোট, ঘর বাড়ীও অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রস্তুত করিয়া থাকে। এদেশে একরকম গাছ হয়, ঐগাছ হইতে এক প্রকার

রস বাহির হয়, ঐরস এত সুন্দর ও আঁঠালো যে বার্ণিস অপেক্ষাও সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বর্ম্মনরা বাঁশ ও কাঠ দ্বারা নানপ্রকার, ঘটি, বাটি, বাক্স, ঝাঁপি এসকল প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গালার কাজ করে। গালার ব্যবহারে জিনিষ গুলি অতি সুন্দর হয়, কিছুতেই উহা চটিয়া যায় না। গালার কাজের শিল্পের এদেশে বিশেষ আদর।

সোণা, রূপা, কাঠ, পিত্তল. পাথর, মাটি এসকলের কাজেও বর্ম্মনরা অদ্বিতীয়।

———

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মদেশের দর্শনীয় স্থান সমূহ

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শনীয় পদার্থ থাকে। মশরের পিরামিড্, ভারতের তাজমহল, চীনের প্রাচীর এইরূপ অনেক জগদ্বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তুর নাম করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশের বিশেষত্ব কি? এককথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—প্যাগোদা। ইরাবতী নদীর মধ্য দিয়া যদি নৌকারোহণে বেড়াইতে বাহির হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে—ঐ নীল পাহাড়ের উঁচু শিখরে, ঘন বনের ছায়ায়, দূর গ্রামের গাছ পালার আড়াল দিয়া প্যাগোদার উচ্চ চূড়াটি দেখা যাইতেছে। যদি তোমরা কোন দিন রেঙ্গুন বেড়াইতে যাও, তাহা-হইলে অতি দূর হইতেই জাহাজের উপরে দাঁড়াইয়া দেখিবে রেঙ্গুন সহরের বড় বড় ঘর বাড়ীর আড়াল দিয়া কলের ও কারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় ঢাকা ধূসর গগনের গায় চিত্রিত ছবিটির মত প্যাগোদার উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই প্যাগোদার বাহার।

আমরা তোমাদের কাছে এই অধ্যায়ে ব্রহ্মদেশে দেখিবার মত যে সকল স্থান, প্যাগোদা, গুহা ইত্যাদি আছে এখানে সে সকলের কথা বলিব। সকলের আগে রেঙ্গুনের কথাই বলিতেছি।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রেঙ্গুন সহরের নাম। এত বড় প্রাচীন ও বৃহৎ সহর এসিয়া মহাদেশেই বড় বেশী নাই। সহরটির বয়সও নেহাৎ কম নয়। রেঙ্গুন নিম্ন-ব্রহ্মের রাজধানী। ইরাবতী নদীর একটী শাখার উপর সহরটি অবস্থিত। সেই শাখা নদীর নাম লাইঙ্গ বা রেঙ্গুন নদী। সমুদ্র হইতে রেঙ্গুন সহর প্রায় বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত। রেঙ্গুন সহরের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, একটী গল্প তেমাদিগকে বলিতেছি। সে অতি আদি যুগের কথা। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে, ব্রহ্মদেশের দুই জন বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ একাকী এক বনের ভিতর বাস করিতেন। এক দিন এই দুই বণিক, ইঁহারা আবার ছিলেন দুই ভাই, অনেক গরুর গাড়ী বোঝাই করা মালপত্র সহ সেই বনের পথে যাইতে যাইতে, এক বৃক্ষতলে তেজঃপুঞ্জ কলেবর

সিউমাও দাও প্যাগোদা।

পেগু—পৃঃ ১১৮

গৌতমকে দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপহার স্বরূপ খানিকটা মধু দিলেন। মধু উপহার দিলে বুদ্ধদেব প্রীত হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি বর প্রার্থনা কর ?" বণিক দুইজন বলিলেন,—"প্রভু! আমরা আর কোন বর চাহিনা, আপনি শুধু কৃপা করিয়া স্মরণচিহ্ন স্বরূপ আমাদিগকে কিছু প্রদান করুন।"

বুদ্ধদেব হাস্য করিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহার মস্তক হইতে আট গাছি কেশ লইয়া তাহাদিকে প্রদান করিলেন। দুই ভাই উহা বহুযত্নে দেশে লইয়া একটী প্যাগোদা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ আট গাছি কেশ তাহাতে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের নাম স্বর্ণমন্দির, উহা রেঙ্গুনে অবস্থিত।

রাজা আলম্প্রার নামটা তোমরা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাও নাই। আলম্প্রা পেগু জয় করিয়া, এখানে আসিয়া এক প্রকাণ্ড প্যাগোদার জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন, সে সময়ে এই নগরের অবস্থা ছিল শোচনীয়, সাধারণ একটা পল্লীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই মাত্র। আলম্প্রা এই নগরের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া নাম দিলেন "রণকুন্" অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ।

কারণ সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহের পর তিনি যে কয় বৎসর শান্তি পাইয়াছিলেন, ঐ সময়ে এই নগরের নির্ম্মাণ কার্য্যেই অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 'রণ-কুন্' শব্দ হইতেই এখন সহরের নাম দাঁড়াইয়াছে রেঙ্গুন।

ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশের রাজার অনুমতি পাইয়া ১৭৯০ সালে প্রথম এস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজের যাদুকরি মায়াদণ্ডের স্পর্শে সে সময় হইতেই সহরের প্রথম উন্নতির সূত্রপাত হইতে থাকে। তার পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাটি ভরাট করিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সহরের শ্রী ফিরাইয়া ফেলিলেন।

'বণিকের মানদণ্ড অবশেষে দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে।" কলিকাতার নিম্নে ভাগিরথী যেমন রেঙ্গুন নদী তাহার চাইতে অনেক বেশী চওড়া—সাগর সঙ্গমের নিকটে ভাগীরথী যতদূর বিস্তৃত রেঙ্গুন নদী সহরের নিম্নে তত-খানি প্রশস্ত। সহর ছাড়াইয়া এই নদীর দুই পাশে সুন্দর-বন অঞ্চলের ন্যায় ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে ঝিল, বাদা

সিউ ডেগোন প্যাগোদার উৎসর্গীকৃত চুল

: ১২৩।
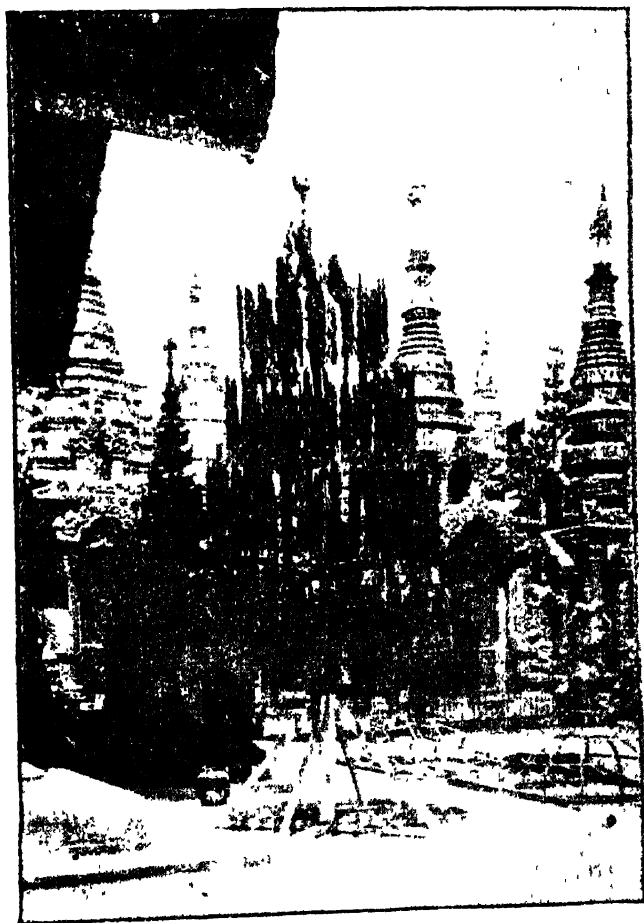
প্রভৃতি। রেঙ্গুন নদী যেমন গভীর, তেমনি প্রশস্ত। নদীর দুইতীরেই সহর অবস্থিত। বাণিজ্য ব্যাপারে এই সহর কলিকাতার পরেই সমৃদ্ধ। এই বন্দরে যত ধান চাউলের আমদানী রপ্তানী হয়, পৃথিবীর কোন বন্দরেই তত হয় না। এদেশের লোকে ভৃত্যের কাজ ও মুটে মজুরের কাজ করা বড়ই ঘৃণ্য বলিয়া মনে করে, এখানে মাল খালাস করা কিংবা মাল জাহাজে তুলিয়া দেওয়া, এসব কাজ যাহারা করে, তাহাদের অধিকাংশই মান্দ্রাজী।

রেঙ্গুন সহর—ইংরেজেরা আমেরিকার সহর নির্ম্মাণের আদর্শে প্রস্তুত করিয়াছেন। বড় বড় সব রাস্তা প্রায় সত্তর হাত চাওড়া—এবং প্রত্যেকটি বরাবর সোজা চলিয়া গিয়াছে, ঐ সব রাস্তা হইতে আবার এক একটি ছোট ছোট রাস্তা বাহির হইয়া বড় বড় রাস্তায় সংযুক্ত হইয়াছে। কলিকাতায় যেমন এক এক রাস্তার এক একটী নাম আছে, যেমন কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুনের রাস্তার সেইরূপ নাম নাই। সেখানে রাস্তার পরিচয় নম্বর দ্বারা হয়, যেমন বাইশ রাস্তা, তেইশ রাস্তা এইরূপ। রাস্তা ঘাট বাড়ী ঘর—এখানে দেখিবার জিনিষ

বটে। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর। এখানকার অধিকাংশ বাড়ীই কাঠের তৈয়ারী। রেঙ্গুন সহরে সুবিখ্যাত বৌদ্ধ প্যাগোদা অবস্থিত হইলেও রেঙ্গুন তীর্থস্থান নহে, না হউক, তাহা সত্বেও এখানকার প্যাগোদা দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহুলোক আসে।

রেঙ্গুন সহরে চীনদেশের লোক খুব বেশী। চীনেরা ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিষয় কর্ম্ম করে এবং ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেজন্য ইহাদের সন্তান বর্ম্মাদের অপেক্ষা গৌরবর্ণ, কর্ম্মঠ ও বলবান হইতেছে। ব্রহ্মদেশের পুরুষেরা যেমন অলস হয়, ইহারা তেমন হয় না। এখানে মান্দ্রাজীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাঙ্গালীর সংখ্যাও আজকাল এক রেঙ্গুন সহরেই দশ হাজারের কম হইবে না। রাজার আমলের বাগানটি আজকাল নানারূপে উন্নত হইয়া নগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। রেঙ্গুন সহরে ট্রামও আছে

রেঙ্গুনের সিঁউদাগোন প্যাগোদা যে কত বড় এইবার তাহার পরিচয় শোন। প্রথমতঃ খানিকটা উপরে উঠিলে—প্যাগোদার দ্বারে প্রবেশ করিবার কাছে
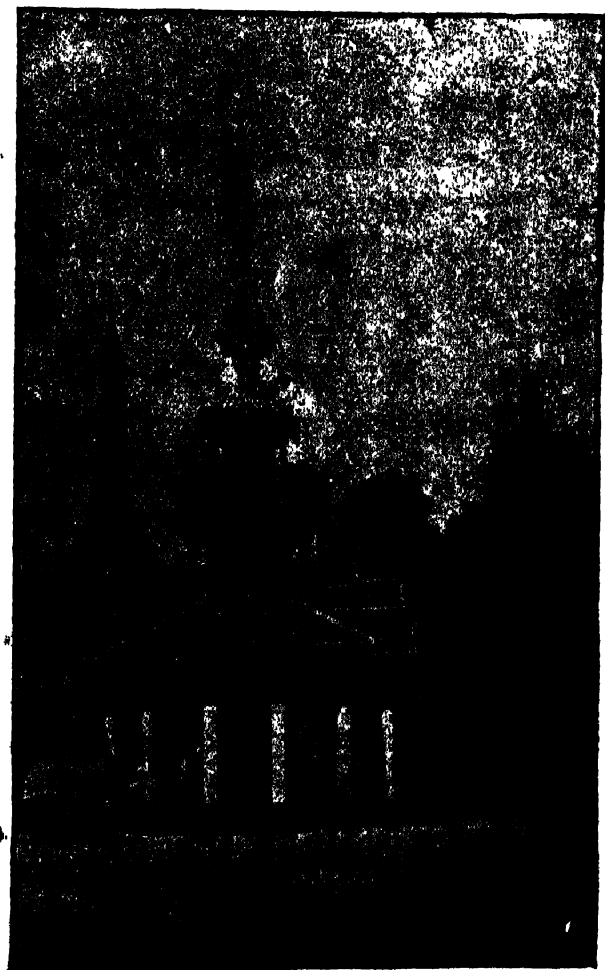
সিউদাগোন প্যাগোদার একাংশ।

রেঙ্গুন—পৃঃ ১২০।

উপস্থিত হওয়া যায়। পাহাড়ের উপর প্যাগোদাটি অবস্থিত। অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত প্যাগোদার কাষ্ঠনির্ম্মিত তোরণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে ৯০০ × ৬৮৫ ফিট সুপ্রশস্ত প্যাগোদার অঙ্গন মধ্যে যাইয়া পৌছান যায়, অতবড় ভিত্তিভূমির মধ্য হইতে প্যাগোদাটি সমচতুষ্কোণ ভাবে ১৩৫৫ ফিট স্থান যুড়িয়া অবস্থিত। প্যাগোদার উচ্চতা ৩৭০ ফিট, সমুদ্রের সমতল হইতে ধরিলে ৫৭৪ ফিট উচ্চ। এই প্যাগোদা কতদিন আগে নির্ম্মিত হইয়াছিল সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই প্যাগোদার নিম্ন ভাগটা সোণার পাতে মোড়া ছিল, এখন আর তাহার কোন চিহ্নও নাই। জনপ্রবাদ এইরূপ যে বহু কারণে এই মন্দিরটি সোণার পাতে মোড়া হইয়াছিল। বলত এত বড় একটা মন্দিরের গোড়াটা মোড়াইতে কত টাকা খরচ পড়ে? মজুরি খরচ ছাড়াও পনের লক্ষ টাকা মূল্যের সোণার কমে হয় না।

আমরা যেমন বলি বুদ্ধ, বর্ম্মনরা বলেন গোদম, সংস্কৃত গৌতম শব্দ হইতে তাহারা বুদ্ধদেবের নাম গোদমা—বা গোদম করিয়া ফেলিয়াছেন। সংস্কৃত শাক্যমুণি শব্দেরও

কিরূপ অপভ্রংশ হইয়াছে শোন। জাপানীরা শাক্যমুণি বলিতে বলেন শাক আর চীনেরা বলেন্ শ—কা। চীনেরা বুদ্ধদেবের নাম আবার আরও সরল সোজা করিয়া ফেলিয়াছেন, যেমন ফো—ফোই—ফো—হি। আর জাপানীরা সোজা কথায় বলেন কৎস্থ। ব্রহ্মদেশে দণ্ডায়মান খোদিত বা চিত্রিত বুদ্ধদেবের নাম মাৎ—তাৎ-কোদাও। আর উপবিষ্ট মূর্ত্তির নাম তিন্—সিন্—কো, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বুদ্ধদেবের নাম শিন্ বিন্-যা ইয়াঙ্গ।

শিউ-দাগোন প্যাগোদার অধিকাংশ বুদ্ধমূর্ত্তির দেহই সোণার কারু-কার্য্য মণ্ডিত বস্ত্রাচ্ছাদিত। প্যাগোদার চারিদিকের প্রকোষ্ঠে যেমন বুদ্ধদেবের নানা অবস্থার মূর্ত্তি আছে, তেমনি সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী ও নানাপ্রকারের বহু অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্ত্তিও রহিয়াছে। এইভাবে উচ্চ চত্বরের চারিদিকে নানা মন্দির—কারুকার্য্য ও বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখা যায়।

একটী মন্দিরের আবার এক অতি বড় ঘণ্টা আছে। এই ঘণ্টাটি ১৪ ফিট উচু ৭॥০ ফিট ইহার বেড়, আর পুরু হইবে প্রায় ১৫ ইঞ্চি। এই ঘণ্টা সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর—ইংরেজেরা এই

আরাকান প্যাগোদা ও পুষ্করিণী।

মন্দালয়—পৃঃ ১২৪।

ঘণ্টাটিকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার জন্য একখানা বড় নৌকায় করিয়া জাহাজের কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এত বড় ঘণ্টার ওজন যে কত হইতে পারে, তাহা তোমরা একটা আন্দাজি অনুমানও করিতে পার, —প্রায় দুইশত মণেরও উপর। এই ঘণ্টাদেবতা কি আর রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইতে পারেন? যেমন নৌকায় ঘণ্টাটি তোলা হইল, অমনি নৌকা উল্টাইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাটি নদীর মধ্যে ডুবিয়া গেল। এই সুবৃহৎ ঘণ্টার নাম—মহাগন্দ্ বা 'অতি সুমিষ্ট স্বর'। বর্ম্মনরা তখন ইংরেজ সেনাপতিকে বলিলেন—"দেখুন, আমরা যদি ঘণ্টাটি জল হইতে তুলিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ত আপনারা আর এইটি এস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবেন না?"

ইংরেজ সেনাপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন বর্ম্মনরা জলের ভিতর হইতে ঘণ্টা দেবতাকে উদ্ধার করিয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বর্ম্মনরা যে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাকেও হারা-ইয়া দেয় তাহারও একটা গল্প শোন। একবার কি যেন কেমন করিয়া একটা বিরাট ব্যাঘ্র আসিয়া সিউদাগুন

প্যাগোদার মধ্যে উপস্থিত হইল। বাঘ দেখিয়া মঠের সাধু-সন্ন্যাসী সকলের মধ্যেই এক মহা আতঙ্কের কারণ ঘটিল। সকলে প্যাগোদার এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—সন্ন্যাসীরা সহরের দুর্গস্থ সৈন্য-দিগকে বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্র পুঙ্গবকে বধ করিয়া প্যাগোদা-বাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

সৈন্যেরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া প্যাগোদায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং খুঁজিয়া পাতিয়া বাঘটিকে বাহির করিয়া তাহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ করিয়া দিল। পরদিন ফুঙ্গির দলই আবার সকলে মিলিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্ররূপী দেবতা তাহাদিগকে দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন, আর কিনা ঐ সব দুর্দ্দান্ত জীবহত্যাকারী সৈনিকেরা আসিয়া এমন করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে! বাঘের ছালটি তৎক্ষণাৎ মন্দিরের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া—ফুঙ্গির দল ব্যাঘ্রপুঙ্গবের আত্মার উদ্দেশে স্তব স্তুতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিছুদিন পরে একটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আরাকান প্যাগোডার প্রবেশ পথ।

প্যাগোদার পশ্চিম দিকে একটী—স্মৃতি মন্দির আছে। এই স্মৃতি মন্দিরটী কো—আউঙ্গ—গি নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ১৯০০ খৃঃ অঃ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। প্রাচীন কালের কারুকার্য্যের সহিত বর্ত্তমান শিল্পকলার কিরূপ পার্থক্য তাহা এই মন্দির হইতে বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

বর্ম্মন স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সুদীর্ঘ চুরুট ফুকিতে ফুকিতে সারাদিন প্যাগোদার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর অলস বর্ম্মন পুরুষের দলকে দেখিতে পাইবে মন্দি-রের ছায়ায় শুইয়া পা নাচাইতে নাচাইতে মনের সুখে চুরুট টানিতেছে। কোথাও বা চারি পাঁচ বৎসরের শিশুটিও চুরুট টানিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। কোথাও দেখিতে পাইবে একদল সায়েম, লঙ্কা বা ভারতবর্ষ তীর্থ যাত্রী প্যাগোদার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দেবতা দর্শন করিতেছে।

তারকেশ্বরের নামে কেশ মানত করিয়া অনেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর সেখানে যাইয়া কেশ কাটিয়া আসেন। এখানেও বর্ম্মন নারীরা বিশেষ কোনও মানত করিয়া এই

প্যাগোদার নিকট আসিয়া তাহাদের বড় সাধের কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ রাজি বিসর্জ্জন দিয়া যায়, ছবিতে দেখ, উৎসর্গীকৃত কেশগুচ্ছ স্তরে স্তরে ঝুলান রহিয়াছে।

(রেঙ্গুনে আর একটী অতি সুন্দর প্যাগোদা আছে, তাহার নাম শিউল প্যাগোদা। এই প্যাগোদার সহিত একটী করুণ শোক-কাহিনী জড়াইয়া আছে। রাজা আলম্প্রা এক তৈলঙ্গ রাজাকে পরাজিত করিয়া এই প্যাগোদার ভিত্তির নীচেই জীবন্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন। এই প্যাগোদায় পিত্তলের নির্ম্মিত বহু গোদম মূর্ত্তি অবস্থিত। আর এই প্যাগোদায়ই শিউদাগোন প্যাগোদার রক্ষয়িত্রী শিউল—নাত্ দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। বর্ম্মনরা ভূত, প্রেত প্রেতিনী এ সকলকে খুব ভয় করে। পাছে শিউল নাত্ দেবী অসন্তুষ্ট হন সেজন্য ইহারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকেন।)

রেঙ্গুন যেমন নিম্ন ব্রহ্মের রাজধানী, মান্দালয় তেমনি উচ্চ ব্রহ্মের রাজধানী। ইরাবতী নদীর তীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী পাহাড়ের উপর নগরটী অবস্থিত। পূর্ব্বে মান্দালয়ের অল্প দূরে অমরাপুর নামক

আরাকান প্যাগোদা
মান্দালয়

রাজা মিনদনের সমাধি।

মান্দালয় দুর্গ- পৃঃ ১২৬।
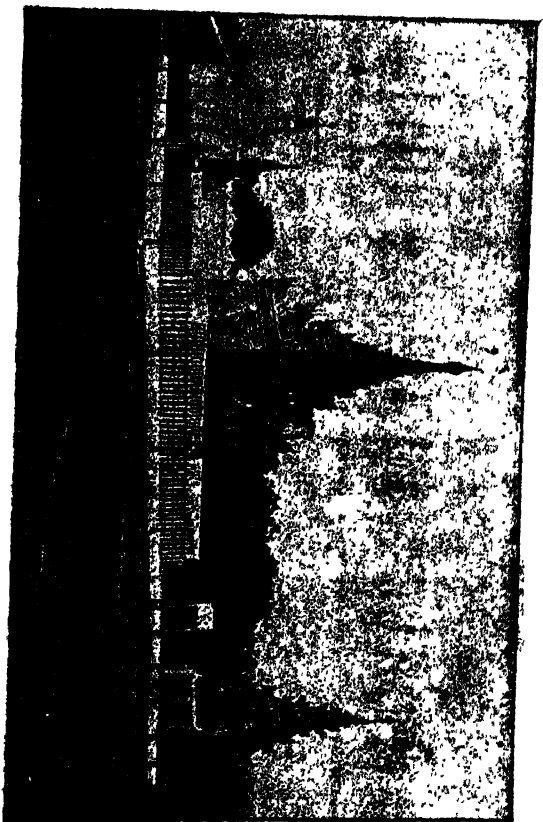
এক সহরে রাজধানী ছিল। রাজা থিবর পিতা অমরা-পুর হইতে মান্দালয়ে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মান্দালয় সহরের উত্তর দিকে মান্দালয় নামে একটী পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের উপর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্যাগোদা আছে।

মান্দালয়ের আরাকান প্যাগোদা খুব বিখ্যাত। ইহার মধ্যে বুদ্ধদেবের একটী অতি বৃহৎ পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে ১৭৮৪ খৃঃ অঃ এই সুবৃহৎ মূর্ত্তিটি আকিয়াব হইতে এস্থলে আনা হইয়াছিল, ব্রহ্ম দেশের কোথাও এত বড় সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি আর একটীও নাই। কারুকার্য্য খচিত রেশমী চাঁদোয়ার নীচে এই মূর্ত্তিটি বিরাজিত। উহার স্তম্ভ অতি সুন্দর। ছাতের নিম্নভাগ বহুমূল্য মণি মুক্তা-খচিত। ২৫২টী প্রকাণ্ড স্তম্ভ, তাহা আবার গিল্টির কারু মণ্ডিত। তাহার উপর প্রকাণ্ড ছাত। তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্তির নিকট যাইতে হয়।

এস্থানে সদা সর্ব্বদা আনন্দ লাগিয়াই আছে। শত শত লোক বুদ্ধদেবের স্তব পড়িতেছেন। শত শত দীপ জ্বলিতেছে, সহস্র সহস্র ধূপদানীতে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য

পুড়িতেছে। ফুলের সৌরভ ও ধূপ ধূনা অগুরুর গন্ধে চারি দিক সুরভিত ও প্রমোদিত।

এখানে বুদ্ধদেবের তিন প্রকার মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান এবং হেলান দেওয়া। এখানে ছোট ছোট শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

১৮৫৬ খৃঃ অঃ রাজা মিন্দনমিন্ মান্দালয় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরের ভিতরে ডফ্রিণ দুর্গ, নামে ইংরেজদের একটী দুর্গ আছে। সহরের মাঝখানে রাজবাড়ী অবস্থিত। মান্দালয়ে থিবোর স্ত্রী সুপেয়ালাটের নির্ম্মিত বিহারও দেখিবার বটে। সুপেয়ালাট তাঁহার জননী শীনবোমের নাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই বিহারটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বিহারটি আধুনিক। বিহারের চারিদিকের সেগুন কাঠের কারুকার্য্য দেখিবার মত। মান্দালয়ে রাজার বাড়ীও কাঠের তৈয়ারী। মান্দালয়ের ভুবন বিখ্যাত প্যাগোদাটী একবার আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছিল।

মান্দালয় দুর্গের মধ্যে রাজা মিন্দনমিনের সমাধি ভবনটীও দর্শনীয়।

শিউ-তা-চাঁদ বা শায়িত বুদ্ধদেব।

পেগু—পৃঃ ১২৮।
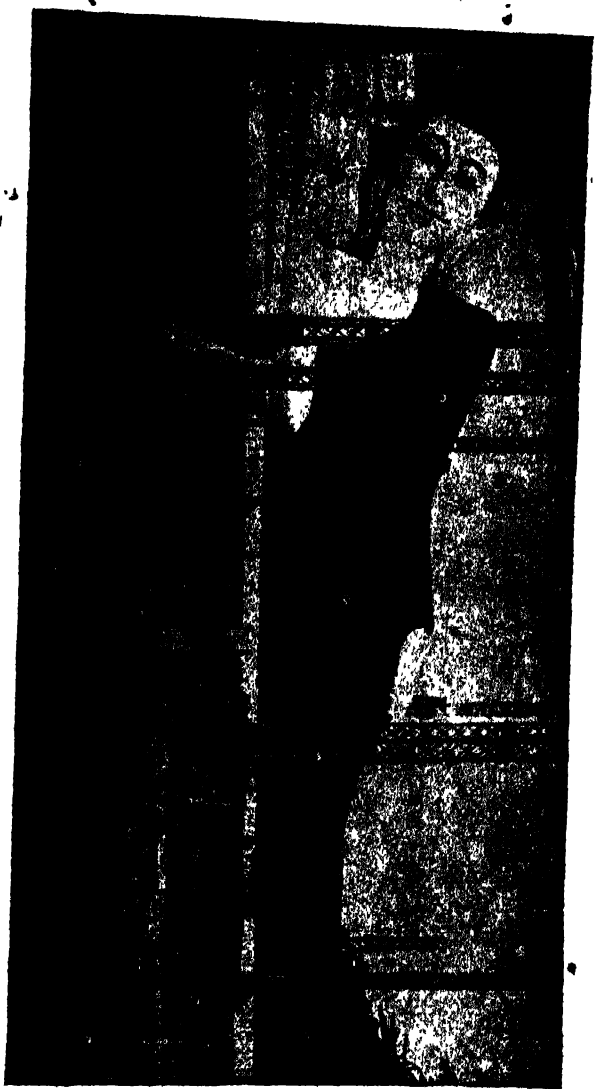
আরাকান প্যাগোদায় যে মূর্ত্তিটী আছে তাহা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। উচ্চতায় ১২ ফিট্ ৭ইঞ্চি। বর্ম্মনরা বলেন যে এই মুর্ত্তিটি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু একথা ঠিক্ নহে। পণ্ডিতেরা ঠিক্ করিয়াছেন যে এই মূর্ত্তি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঢালাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এইত গেল প্যাগোদার কথা। সহর সেই রেঙ্গুনের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানেও ট্রাম গাড়ী আছে। সহরটি ছয় মাইল দীর্ঘ। এখানকার রেশমী লুঙ্গি জগৎবিখ্যাত। এখানে অতি ভোরে বাজার বসে। বাজারে নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ পত্র কেনা বেচা চলে।

ব্রহ্মদেশের আর একটী প্রাচীন সহরের নাম পেগু।

পেগুর কথা

তালয়ঙ্গ রাজাদের ছিল ইহা সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী। বন্দর হিসাবেও এই নগরের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। বর্ত্তমান সময়েও পেগু সিতাংখাল নামক একটী সুদীর্ঘ খাল দ্বারা পেগুর সহিত সংযুক্ত থাকায় ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে অতি সুবিধাজনক। এক সময়ে পেগু সহর সুপ্রসিদ্ধ ছিল, রাজা আলম্প্রা প্রায় দেড়শত

বৎসর পূর্ব্বে সহরটী ধ্বংস করিয়া ইহার সমুদয় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তবু এখানকার শিউমা-দা প্যাগোদা না দেখিলে, কিছুই দেখা হইল না! এই প্যাগোদাটীর গঠন ঘণ্টাকৃতি।

শিওতা চাঙ্গের মূর্ত্তি।

পেগুতে আর দুইটী দর্শনীয় জিনিব আছে। একটী হেলান দেওয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। এই বুদ্ধ মূর্ত্তির নাম শিউ-তা চঙ্গ বা শিন্ বিন্-থা-লায়ঙ্গ। মূর্ত্তিটীর দৈর্ঘ্য হইতেছে ১৮০ ফিট আর উচ্চতা ৫০ ফিট্। এ ব্যাপারটী কি কল্পনা কর দেখি! এই মূর্ত্তিটী ইটের তৈরী, অনেক দিন আগে কেহ ইঁহার খোঁজও জানিত না। তখন বন জঙ্গলে—এমন সুন্দর ও সুবৃহৎ মূর্ত্তিটী সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। মান্দালয় হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত রেল ওয়ে লাইন খুলিবার জন্য পথ প্রস্তুত করিবার সময় এই মূর্ত্তিটী রেল কোম্পানীর লোকেরা দেখিতে পাইয়া ছিলেন। সে সময় হইতেই এই মূর্ত্তিটী সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এখন নূতন করিয়া মূর্ত্তির যে যে স্থানের অঙ্গহানি হইয়াছিল, তাহার সংস্কার করা হইয়াছে। মূর্ত্তিটীর হাতের অঙ্গুলি ও নখ সোনায় মুড়িয়া দেওয়া

নায়টৈকের রেলপথ।

পৃ ১২৩
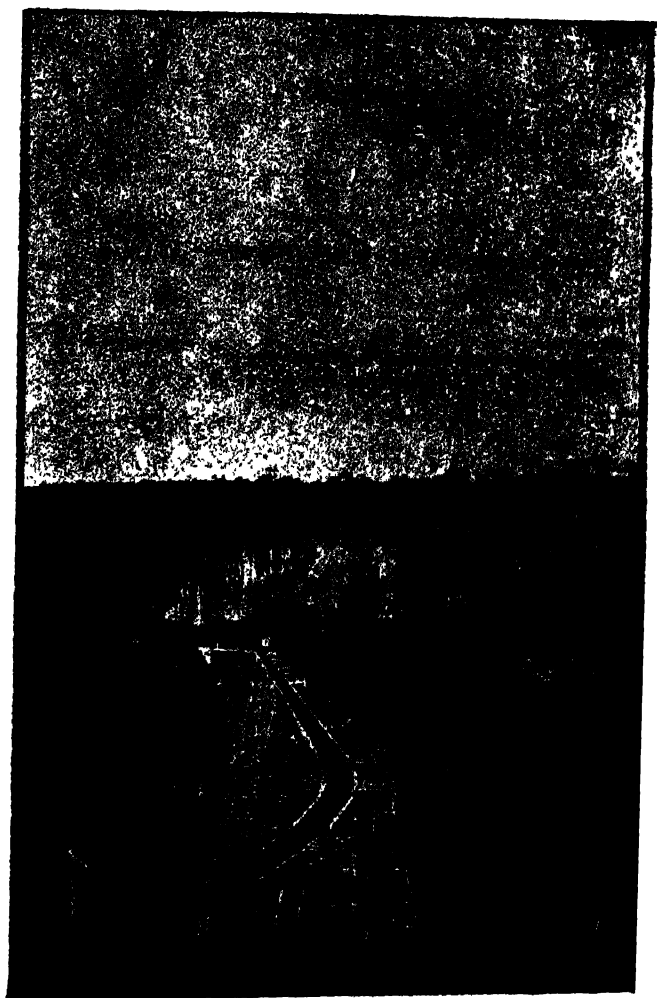
হইয়াছে, শত শত তীর্থ-যাত্রী আসিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া যাইতেছেন। মূর্ত্তির নিকটে পৌঁছিবার জন্য সিঁড়ি লাগান আছে। পেগুর সন্নিকটে আর একটী প্যাগোদার চারিদিকে চারিটি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। তাহার এক একটি মূর্ত্তির উচ্চতা ৯০ ফিটের ন্যূন নহে। ছবিতে দেখ একটি মূর্ত্তির কাছে যে মানুষটি দাঁড়াইয়া আছে মূর্ত্তির তুলনায় তাহার আকৃতি কিরূপ।

এইবার তোমাদের কাছে ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজধানী আবার কথা বলিব। ব্রহ্মদেশে

আবানগরের কথা

আবার ন্যায় প্রাচীন সহর আর একটীও নাই। ১৩৬৪ খৃঃ অঃ আবানগরের প্রথম পত্তন। অমরপুর সহর হইতে আবা খুব বেশী দূরে নহে। এই নগরটি চতুষ্কোণ। এক এক দিকে এক মাইলের বেশী লম্বা নহে। নগরের ঠিক্ মাঝখানে এখনও প্রাচীন রাজবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সেগুণকাঠের খুঁটির বেড়া, এক একটা খুঁটি চৌদ্দ পনের হাত লম্বা। এইরূপ পর পর তিনটি বেড়ার পর ইটের প্রাচীর। রাজবাড়ীটি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। রাজবাড়ীর সম্মুখেই দরবার গৃহ।

এই ঘরটি ১৭৪ হাত লম্বা। সমস্তটাই সেগুণ কাঠের তৈয়ারী। ভিতরে ও বাহিরে বিবিধ কারুকার্য্য এবং গিল্টির কাজ করা। দরবারের ঘরের ভিত্তিটি শ্বেত-প্রস্তরের। এই প্রকাণ্ড দালানের পশ্চাদ্দিকে মন্ত্রণা-গার এবং অন্যান্য ঘরগুলি অবস্থিত। সকলের পশ্চিম-দিকে রাজার অন্তঃপুর ও ফুলে ফলে ভরা উদ্যান ও স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ দীঘি—সরোবর।

এই রাজবাড়ীতেই ধনাগার, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, ও টাঁকশাল, শ্বেতহস্তীর পিলখানার প্রভৃতি অবস্থিত। রাজবাড়ী, গম্বুজের উপর জলঘড়ী ছিল। ঘড়ীর নিকটস্থ একটী কক্ষে সর্ব্বদা লোক থাকিত, যখন যতটা বাজিত, তাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইত।

ইংরেজেরা যখন রাজা থিবকে পরাজয় করিয়া রাজ-বাটী অধিকার করিয়া থিব ও তাহার রাণীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, সে সময়ে ঘণ্টা বাদকেরা পলাইয়া গিয়া-ছিল, নগরবাসীরা ঘণ্টারব শুনিলেই বুঝিতে পরিত যে রাজ্যে কোন বিপত্তি নাই, কিন্তু ঘণ্টারব নীরব হইলে, তাহারা মনে করিল যে রাজধানীতে কি জানি বিপদ ঘটিয়াছে। দোকান পসার সব বন্ধ ছিল। ইংরেজেরা
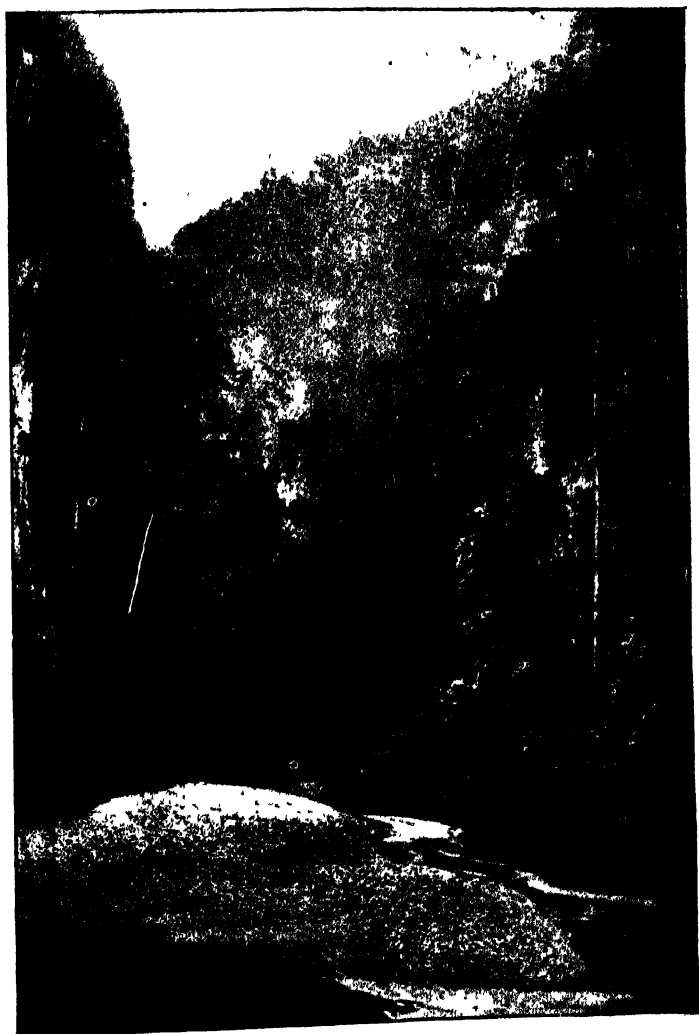
গয়টেক্ গুহার সম্মুখভাগ।

পৃঃ ১৩০।

রাজপুরী অধিকার করিয়াই ঘড়ীর ঘরে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন, অমনি নগরবাসীরা বুঝিল যে সমুদয় গোলমাল নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। রাজধানীতে আর কোনও হৈ চৈ দেখা গেলনা, লোকেরা পূর্ব্বের ন্যায় দোকান-পাট খুলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বেচা কেনা ও কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রাজ্যের অন্য কোনও সংবাদের জন্য কেহই কোন ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। ব্রহ্মের স্বাধীন রাজ্য চিরদিনের জন্য পরাধীন হইল।

এই যে প্যাগোদার কথা বলিয়াছি ইহাই ব্রহ্মদেশের বিশেষত্ব। সকল প্যাগোদার গঠন-প্রণালীই প্রায় একরূপ, তবে কোন কোনটিতে কলা-কৌশলের অনেক খানি পার্থক্য আছে। মোলমিন, ক্যাদো, মিন্‌গিন এইরূপ বহু নগরে প্যাগোদার সমাবেশ আছে।

গয়টেক নামক স্থানে পাহাড়ের গুহার মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে, সেই গুহাটি যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানটি পরম রমণীয়। কোথাও নির্ঝর ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছে, কোথাও শত শত সুন্দর পাখী মধুর স্বরে গান ধরিয়াছে, আর সেই বনের ছায়ায় শান্ত ভাবে পথ চলা,

কি সুন্দর শান্তিজনক যে তাহা বলিয়া বুঝান যায় না।

এখন ব্রহ্মদেশে বেড়াইতে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা কিংবা চট্টগ্রাম হইতে জাহাজে চড়িয়া সেখানে যাওয়া যায়। তোমরা যখন বেড়াইবার মত ক্ষমতাবান হইবে, তখন একবার, এক-দিনকার স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ভারতের চির গৌরব বুদ্ধদেবের চরণাশ্রিত বৌদ্ধ ব্রহ্ম দেখিয়া আসিও, তখন আপনা হইতেই ভারতের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিবে। আপনা হইতেই দেশ মাতার প্রতি আরও অধিক অনুরক্ত হইয়া বলিবে—

"দেবী আমার, সাধনা আমার, আমার দেশ!"

সমাপ্ত